বিশ্বযুদ্ধের
রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত্ত
অমিতাভ রায়

বিশ্ব যুদ্ধের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত

অমিতাভ রায়

এন. ই. পাবলিশার্স
১৬, মতিলাল মল্লিক লেন
কলকাতা—৭০০০৩৫

প্রকাশক : শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপন ঘোষ, এন. ই. পাবলিশার্স, ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা—৭০০০০৫ দ্রোভাগ—৫২৯৭৪ ২/১বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা—৭০০০২৯ দ্রোভাষ-৭৪-০৫৯৮ প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৯২ প্রচ্ছদ ধীরেন শাসমল মুদ্রক : অজিত কুমার দত্ত, দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ৫০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলকাতা—৭০০০০৯ মূল্য : ১৮'০০ টাকা

ISBN-81-85136-19-X

সৌরেন চক্রবর্তী

রণেন চক্রবর্তী

প্রীতিভাজনেষু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নারকীয় এবং নাটকীয় ঘটনাবলী মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। মহাযুদ্ধের নারকীয় নাটকের কুশীলবদের উত্থান-পতনের সঙ্গে মিথ্যাচার, গুপ্তহত্যার-চেষ্টা, আগ্রাসী আক্রমণের মুখেও শান্তির ললিত বাণী মুখে উচ্চারন করা, কিংবা ধসের পর ধস নেমে জার্মানীর পতন বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীতে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছে একের পর এক। সেই সব দিনের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনাকে একত্র করে এই গ্রন্থে দেওয়া হল। আরো অনেক চমকপ্রদ ঘটনার কথা বারান্তরে লেখার ইচ্ছা রইল।

এই বইটি লেখা হল অনুজপ্রতিম স্বপন ঘোষের তাগাদায়। এই বইয়ের যাবতীয় দোষ আমার এবং গুণ সবটা স্বপনেরই প্রাপ্য।

অমিতাভ রায়

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রোমেল

রাসপ্রটিন

কমবোডিয়া

আশা নিরাশার দিনগুলি

যুদ্ধের রণদামামা যেদিন বাজল

হিটলারকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বৃটিশ ও ফরাসী সরকার। তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন, হিটলারের কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক থাকে। মুখে যখন হিটলার শান্তির প্রস্তুতির কথা বলেন তখন তিনি আক্রমণের ছকও সম্পূর্ণ করে নেন। এক ফুৎকারে শান্তির ভেককে সরিয়ে দিয়ে অস্ত্রসম্ভার নিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে করতে পারেন। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর সজ্ঘর্ষ যে কোন সময় সুরু হতে পারে।

আশার আলো তবু ধিকৃধিক্ করে জ্বলছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের তরফে চেষ্টা চলছিল আপোষ আলোচনার মাধ্যমে জার্মানী-পোল্যাণ্ড সমস্যার সমাধানের। উদ্যোগ নিয়েছিল বৃটেন, রাজনৈতিকভাবে এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিল জার্মানী। ফ্রান্স এই উদ্যোগে বৃটেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

হ্যালিফ্যাক্স ও হেণ্ডারসন উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসের এক জটিল মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন যুদ্ধের জোয়ারকে শান্তির মোহনার দিকে টেনে আনতে। কর্ণেল বেককে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন—আর এক মুহূর্ত দেরী না করে এখনি জার্মানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে সচেষ্ট হন। উনিশশো উনচল্লিশ সালের তিরিশে আগষ্ট, গভীর রাতে, হ্যালিফ্যাক্সের এই নির্দেশ পৌঁছেছিল। কেনার্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—জার্মানীর সঙ্গে যে আলোচনা ও লেখালেখি ব্রিটেনের তরফে করা হয়েছে তার প্রতিলিপি কর্ণেল বেককে পৌঁছে দিতে।

হেণ্ডারসনও পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতকে বার বার বোঝাচ্ছিলেন—এখন জেদ ধরে বসে থাকার সময় নয়। সর্বনাশা এক যুদ্ধ মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। এখন যদি আলাপ আলোচনায় জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করা যায় তাহলে আখেরে সকলেরই লাভ হবে।

একত্রিশে আগষ্ট হেণ্ডারসন সকাল আটটায় ফোন করলেন লিপস্কিকে। সরাসরি বললেন, দুপুরের মধ্যে যদি আপনাদের তরফে জার্মানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার কোন উদ্যোগ না নেন তাহলে সূর্যাস্তের সময় আমাদের শুনতে হবে যুদ্ধের রণদুন্দুভি।

কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছলেন দাহলারেস। সুইডিস এই ব্যবসায়ীটি তখন বিশেষ এক ভূমিকা পালন করছিলেন। তাঁর শান্তির দূতিয়ালী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে। দাহলারেস তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন জার্মানীর তরফের প্রস্তাব। হেণ্ডারসন প্রস্তাব সহ দাহলারেসকে পাঠিয়ে দিলেন পোল্যাণ্ডের দূতাবাসে। সঙ্গে পাঠালেন ফরবেসকে।

লিপস্কি জানতেনই না কে এই দাহলারেস। আগে কখন এর নামও শোনেননি। তিনি ভাবছিলেন, এই লোকটিকে আমার কাছে কেন পাঠালেন হেণ্ডারসন? এর সঙ্গে কি আলোচনা করব?

ক'দিনের ঘটনায় ক্লান্ত শ্রান্ত লিপস্কিকে কোন সময় না দিয়েই দাহলারেস শুরু করেছিলেন তাঁর বক্তব্য। তিনি বোঝাচ্ছিলেন লিপস্কিকে—আপনি এখনই গোয়েরিং-এর সঙ্গে দেখা করুন। ফ্যুয়েরার হিটলার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটাও গ্রহণ করে নিন।

লিপস্কি ভেতরে ভেতরে বিরক্তিতে ফেটে পড়ছিলেন। তবু কূটনৈতিকের শান্ত অভিব্যক্তিতে তিনি দাহলারেসকে বললেন, পাশের ঘরে আমার সেক্রেটারী আছে। অনুগ্রহ করে তাকে বলুন ফ্যুয়েরারের এই প্রস্তাবের বয়ানটি টাইপ করে দিতে। দাহলারেস পাসের ঘরে চলে গেলেন চিঠি টাইপ করে নিতে।

এবার আর বিরক্তি চেপে রাখলেন না লিপস্কি। ফরবেসকে সরাসরি বললেন—এসব কি হচ্ছে কি? একটা লোককে চিনি না জানিনা, তার নামই শুনিনি কখনও। সে এসে কিনা আমাকে বলছে—এখনই গোয়েরিং-এর কাছে যান, এখনি হিটলারের প্রস্তাব মেনে নিন—এসব কথা বলার সে কে? আর এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ববাহুত একজনের অনুপ্রবেশ ঘটতেই বা দেওয়া হচ্ছে কেন?

লিপস্কি আসলে বিরক্ত হয়েছিলেন হেণ্ডারসনের ব্যবহারে। ক'দিন ধরে ক্রমাগত তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন হেণ্ডারসন। জটিল সমস্যার মধ্যে এই চাপ সৃষ্টি তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। কূটনীতিক হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন—যতই চাপ আসুক না কেন, অজানা অচেনা সুইডিস নাগরিক দাহলারেসের কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে মূর্খামি। কেননা দাহলারেস তার সঙ্গে যেটি এনেছে সেটি জার্মানীর তরফে কোন সরকারী প্রস্তাব নয়—একটি ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠানো ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের এক প্রস্তাব।

একত্রিশে আগষ্ট হ্যালিফ্যাক্স একটি তারবার্তা পাঠালেন কেনার্ড-কে। তাতে লেখা ছিল—পোলিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলুন তারা যেন এখনি বার্লিনের পোলিস দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানকার রাষ্ট্রদূত মারফৎ জার্মান সরকারকে

এখনই জানাতে হবে যে জার্মানীর প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পোলিশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। জরুরী ভিত্তিকভাবে বিষয়টির ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বেকও দেখা করলেন লিপস্কির সঙ্গে। বললেন, আপনাকে তো অনুরোধ করলাম রিবেনট্রপের সঙ্গে কথা বলতে। এখন রিবেনট্রপ যদি আপনাকে জার্মানীর প্রস্তাব হাতে তুলে দেন—তখন আপনি কি করবেন?

এক মিনিটও ভাবতে সময় নেননি লিপস্কি। প্রশ্নের উত্তর যেন তাঁর ঠোঁটের ডগাতেই ছিল। তিনি বললেন—রিবেনট্রপের দেওয়া প্রস্তাব আমি গ্রহণই করবোনা। অতীতে এই ধরণের জার্মান প্রস্তাব আমরা পেয়েছি। জার্মান ছলা-কলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে গিয়েছে। ওদের কোন ছলাকলায় আর ভুলছিনা। নিলে দেখতে পেতেন এই প্রস্তাবের আড়ালে আসলে আছে এক চরমপত্র, হুঁশিয়ারী।

বেক তবু হাল ছাড়লেন না। বললেন—অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যা বলছেন তা হয়তো যথার্থ। তবু এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হল, জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা। তারপর তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে কোথায় কখন কার সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এটা করলে হাতে কিছু সময় পাওয়া যাবে। এই সময় পাওয়াটা আমাদের পক্ষে এখন খুবই জরুরী।

কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গিয়েছে। পোল্যাণ্ডের তরফে উত্তর পাবার জন্য জার্মানীর তখন আর কোন ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ছিলনা। এই রকম একটা সময়ে—লিপস্কির সঙ্গে বেকের কথা হওয়ার একঘণ্টার মধ্যে—লিপস্কির কাছ থেকে একটি তারবার্তা গিয়ে পৌঁছেছিল রিবেনট্রপের দপ্তরে। তারবার্তাটিতে লেখা ছিল—পোল্যাণ্ড সরকারের মনোভাব সাক্ষাতে জানাবার জন্য রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাতে আমি আগ্রহী। কয়েক ঘণ্টা পর রিবেনট্রপের দপ্তর থেকে একটি ফোন পেয়েছিলেন লিপস্কি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জার্মানীর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানতে চান যে, আপনি পোল্যাণ্ড সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন দূত হিসেবে রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করতে চান—না নিছক রাষ্ট্রদূত হিসাবেই আপনি আসবেন?

উত্তরে লিপস্কি জানিয়েছিলেন—পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত হিসাবেই তিনি দেখা করতে চান। এবং কূটনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিবেদন তিনি পৌঁছে দিতে আগ্রহী।

অবশেষে সন্ধ্যে ছ'টা বেজে পনেরো মিনিটে রিবেনট্রপ-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ পেলেন লিপস্কি।

রিবেনট্রপ শীতল চোখে তাকিয়ে ছিলেন লিপস্কির দিকে। তারপর বলেছিলেন—আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার রাষ্ট্রের তরফে আপনার ভূমিকা কি? সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাধারী বিশেষ দূত হিসাবে এসেছেন—নাকি নিছক একর্জন রাষ্ট্রদূত হিসেবে?

লিপস্কি বলেছিলেন—আমি তো আগেই জানিয়েছি, রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার রাষ্ট্রের এক বিশেষ বার্তা আমি বয়ে এনেছি। আপনাকে সেটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছি।

রিবেনট্রপ জানিয়েছিলেন লিপস্কিকে—আমি কিন্তু আপনার রাষ্ট্রের তরফে একজন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাধারী দূতকে পাবো বলে আশা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা ঘটেনি। যাই হোক, আমি ফ্যুয়েরারকে সব জানাবো।

ক্লান্ত বিধ্বস্ত লিপস্কি তাঁর দূতাবাসে এসে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর টেলিফোনের দিকে। রাজধানী ওয়ারশ'তে এখনি জানানো দরকার ঘটনার গতি কোন দিকে। রিবেনট্রপের শীতল চাউনি থেকে তিনি পড়ে নিতে পেরেছিলেন, জার্মান আক্রমণ ঘটতে আর খুব বেশী দেরী নেই। কিন্তু টেলিফোনে হাত দিয়ে রিসিভার তুলে তিনি বুঝতে পারলেন—ওয়ারশ'কে আর কোন খবর এখন তিনি পাঠাতে পারবেন না। জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁর টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে।

লিপস্কি যেটা জানতেন না তা হল, জার্মান গুপ্তচর গেস্টাপোরা

অনেক আগেই রিবেনট্রপকে জানিয়েছিল যে, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ থেকে পাঠানো তারবার্তায় জানানো হয়েছিল একজন বিশেষ দূত বার্লিনে আসছেন—কিন্তু এই বিশেষ দূতকে বিশেষ কোন ক্ষমতা না দিয়েই পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেওয়া হবে রিবেনট্রপও সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিয়েছিলেন। বিশেষ দূতকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে আলোচনায় যখন ডাকলেন রিবেনট্রপ তখন তার দূতাবাসের টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে গিয়েছিল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে। লিপস্কির হাতে টেলিগ্রাম পৌঁছানোর আগে গেস্টাপোরা সেই টেলিগ্রামের বয়ান পৌঁছে দিতে পেরেছিল রিবেনট্রপের কাছে।

গেস্টাপোদের পাঠানো টেলিগ্রামের একটি কপি গোয়েরিংকেও পাঠানো হয়েছিল। টেলিগ্রামটি এক নজরে দেখে গোয়েরিং সেটা দিয়েছিলেন দাহলারেসকে। দাহলারেসকে তখুনি নির্দেশ দিয়েছিলেন গোয়েরিং—যান, এই টেলিগ্রামের কপি হেণ্ডারসনকে দেখিয়ে আসুন। তাকে বলবেন, এই টেলিগ্রামই প্রমাণ দিচ্ছে শান্তি প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড কতটা অনাগ্রহী।

এ সবই কিন্তু কথার কথা। শান্তির প্রতি কোন আগ্রহ তখন জার্মানীর ছিলনা। রাজনৈতিক ভাঁওতার আশ্রয় নিয়ে ব্রিটেনকে পোল্যাণ্ডের পাশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার পথ ও পন্থার সন্ধানে তারা তখন নিয়ত ব্যস্ত ছিল। তার মধ্যেই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনা, দিনক্ষণ সব কিছুর ছক তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। একত্রিশে আগষ্ট হিটলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—আগামীকাল থেকে শুরু হবে সমর অভিযান।

হিটলার ৩১ শে আগষ্ট সন্ধ্যে বেলায় "পরম গোপনীয়" নির্দেশনামা নং-এ লিখেছিলেন শান্তির মাধ্যমে কোন সমাধান সূত্র মিললো না বলে সৈন্যবল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সমাধানের পথ বের করে নেব।

আক্রমণের দিন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এবং আক্রমণের সময় ভোর চারটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যদি দেখা যায় এই আক্রমণে ফ্রান্স ও

ইংলণ্ড সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে পোল্যাণ্ডের দিকে তাহলে পশ্চিম দিকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়ে যুদ্ধ বিজয়ের অনুকূল পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা করে নিতে হবে। নির্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আঘাত হানতে হবে শত্রুপক্ষের সামরিক ঘাঁটির ওপর। তবে এই আঘাত হানার চরম সিদ্ধান্ত একমাত্র ফ্যুয়েরারের কাছ থেকেই পেতে হবে।

জার্মান নৌবাহিনীর কাজ হবে সমুদ্রে ইংলণ্ডের দিকে ধাবমান পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করা।

জার্মান বিমান বাহিনীর কাজ হবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিমান বাহিনী যাতে কোন রকম বিমান আক্রমণ জার্মান সৈন্যদের ওপর করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও শত্রু বিমানকে যতটা বেশী পরিমাণে পারা যায়—ঘায়েল করা।

এই যুদ্ধ পরিচালিত হবার সময় খেয়াল রাখতে হবে, সমুদ্র পথে বৃটেন কোন কিছুর সরবরাহ যাতে না পায়। সরবরাহকারী জাহাজ-গুলোর ব্যাপক ক্ষতি করতে হবে। সুযোগ বুঝে ব্রিটেনের নৌঘাঁটি-গুলোকে আক্রমণ করে চুরমার করে দিতে হবে। ব্রিটেন যাতে ফ্রান্সে কোন রকম ভাবে সৈন্য পাঠাতে না পারে সে দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। এরকম কোন উদ্যোগ চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে শত্রু সৈন্যকে বিনাশ করতে হবে।

প্রস্তুতি রাখতে হবে এমন ভাবে যে ইংলণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে আমাদের এক লহমাও দেরী না হয়। ব্রিটেন আক্রমণের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আজ না হলেও হয়তো আগামী কালই জার্মান সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইংলণ্ডের মাটিতে। তবে লণ্ডন আক্রমণের কথা এখনই ভাবা হচ্ছে না। লণ্ডন আক্রমণের দিনক্ষণ স্থির করার সিদ্ধান্ত নেবেন হিটলার স্বয়ং। ব্লপ ছকে নিচ্ছিলেন। তাঁর নির্দেশনার খসড়া তখন তৈরি—আক্রমণের দিনক্ষণ সব ভাবা হয়ে গিয়েছিল। তবু একটা সংশয় তাকে মানসিক উত্তেজনায় রেখেছিল। তা হল—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই

যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না। যদি না দাঁড়ায় তাহলে তো মিটেই গেল। আর যদি দাঁড়ায় তাহলে যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়বে ইউরোপের অনেকটা ভূখণ্ড জুড়ে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় জার্মানী নিজে থেকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে আক্রমণ করবে না। যদি কোন আক্রমণ ঐ দুই দেশ থেকে জার্মান সৈন্যদের ওপর ঘটানো হয় তাহলে পাল্টা আক্রমণে মোকাবিলা করে বিধ্বস্ত করতে হবে শত্রুবাহিনীকে।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত হিটলার উনিশশো উনচল্লিশের একত্রিশে আগষ্ট বেলা বারটা বেজে তিরিশ মিনিটে নিলেও—এই যুদ্ধের ছক তিনি ছকে ফেলেছিলেন তার আগের দিন সন্ধ্যা ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে। তাঁর এই ছকের কথা জানতেন ফ্যুয়েরার অনুগামী সেনানীরা। সম্ভবত তাই দেখতে পাই হালডারের ডায়েরীতে স্পষ্ট ভাবে লেখা—তৈরি হও, সমস্ত ব্যবস্থা নাও। সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে ভোর সাড়ে চারটায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে পোল্যাণ্ডের ওপর। যুদ্ধ যদি পিছিয়েও যায় তাহলে পয়লা সেপ্টেম্বরের বদলে দো'সরা সেপ্টেম্বর হবে। এই একদিন পেছানোটা বৃটিশ শান্তি উদ্যোগের ওপর নির্ভর করছে। তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী এই অবস্থা থাকবে না। পর দিনই আমরা যুদ্ধ শুরু করছি। তবে এখন ধরে নিতে হবে আমরা পয়লা সেপ্টেম্বর ভোররাত থেকে আক্রমণে নামছি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

শান্তির ভেক ধরে হিটলার যেদিন পৃথিবীর সবাইকে জানাচ্ছিলেন যে পোল্যাণ্ডের দূতের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করছেন সেদিনই অর্থাৎ একত্রিশে আগষ্ট উনিশশো উনচল্লিশ সকাল সাড়ে ছ'টায় নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন জার্মান সেনাধ্যক্ষের কাছে—আমরা, আগামীকাল পয়লা সেপ্টেম্বর, পোল্যাণ্ড আক্রমণ করছি।

লিপস্কি এই হিটলারী ভাঁওতা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে

রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যা ছ'টা বেজে পনেরো মিনিটে।

ততক্ষণে যুদ্ধের প্রস্তুতির ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল জার্মান শিবিরে।

একত্রিশে আগষ্ট রাত ন'টায় জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন ফ্যুয়েরার হিটলার। গোয়েবলসের পরামর্শ মতো তৈরি সেই ভাষণে হিটলার এমন সব কথা বলেছিলেন যা কখনও আলোচিত হয় নি। পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর দেওয়া এমন সব প্রস্তাবের কথা শুনিয়েছিলেন জার্মানবাসীদের—যা কোনদিন উত্থাপিতই হয়নি। হিটলার বলেছিলেন,—যুদ্ধ এড়াবার জন্য ব্রিটিশ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমরা পোল্যাণ্ড সরকারের কাছে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন দূত পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি—তখন আমাদের কাছে খবর এল যে সীমান্ত জুড়ে পোলিশ সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে।

আমরা শান্তির জন্য অবিরাম চেষ্টা যখন চালাচ্ছিলাম ঠিক তখনই পোলিশ সৈনিকদের কামানের নল আমাদের দিকে তাক করা হচ্ছিল।

দু'দিন ধরে জার্মান সরকার অপেক্ষা করেছে এই ভেবে যে পোল্যাণ্ডের তরফে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ আলোচনার জন্য আসবেন—কিন্তু কেউ আসেননি। অগত্যা আমরা ধরে নিচ্ছি পোল্যাণ্ড শান্তিতে আগ্রহী নয়। তারা অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্তে অবিচল রয়েছে।

জার্মানবাসীকে হিটলার বোঝাতে চেয়েছিলেন, জার্মানী নয়—আসল আক্রমণকারী হল পোল্যাণ্ড। অনিচ্ছা সত্বেও জার্মানীকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

একত্রিশে আগষ্ট সন্ধ্যে থেকে জার্মানী ছিল বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। রেডিওতে বারবার শোনানো হচ্ছিল শান্তির জন্য ফ্যুয়েরারের প্রচেষ্টার কথা এবং পোল্যাণ্ডের আগ্রাসী যুদ্ধবাজ মনোভাবের কথা। ওয়ারশ, লণ্ডন ও প্যারিসের যোগাযোগকারী সব টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

রাতের তারারা তখনও মিটমিট করে জ্বলছিল—পূর্বদিগন্তে রোজ দিনকার মতো উঠেছিল সূর্য্য। তবু দিনটি ছিল স্বতন্ত্র। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ভোরের প্রথম আলোকের সঙ্গেই জার্মানী 'কেসহোয়াইট' অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পোল্যাণ্ডের ওপর।

আকাশে প্রচণ্ড শব্দ তুলে জার্মান যুদ্ধ বিমানগুলি কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপুলভাবে লক্ষ্যভেদ করে ধ্বংস করল পোল্যাণ্ডের অস্ত্রভাণ্ডার, সেতু, রেল লাইন, জন অধ্যুষিত এলাকা। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর তাবৎ কালের ভয়ঙ্করতম আক্রমণে চরমভীতির সঞ্চার করে শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ—দীর্ঘ ছ'বছর স্থায়ী যে যুদ্ধ পৃথিবীকে পরিচিত করেছিল অবিরাম ধ্বংসের সঙ্গে। এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোটি কোটি মানুষ—মহিলা, শিশু নির্বিশেষে, ভয়াবহ এক সর্বনাশের মুখোমুখী হয়েছিল।

আকাশে যখন বিমান বাহিনী আক্রমণ শাণিত করছিল পোল্যাণ্ডের ওপর—তখন স্থল সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ডের উত্তর দিকে ও পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে ট্যাঙ্কবাহিনী নিয়ে আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে

তুলেছিল পোল্যাণ্ডের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে। কামানের গর্জনে বারুদের গন্ধে বাতাস তখন ভারী।

বার্লিনের রাস্তা সেদিন জনশূন্য। উনিশশো চোদ্দ সালে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে উন্মাদনা জেগেছিল সারা দেশ জুড়ে উনিশশো উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর তা ছিল না। বেলা দশটায় হিটলার তাঁর চ্যান্সেলারী থেকে যখন জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য রাইখস্টাগে রওনা হয়েছিলেন তখনও রাস্তা ছিল জনশূন্য।

তাঁর ভাষণে হিটলার সেদিন জার্মানবাসীকে শুনিয়েছিলেন এক পরম মিথ্যা সংবাদ—অবশ্য গোয়েবল্স এই পদ্ধতিকেই পরে ক্রমাগত ব্যবহার করে ইতিহাসের কুখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। তিনি বলেছিলেন—আমি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চাইনি—চেয়েছিলাম শান্তি। আমার শান্তির প্রচেষ্টাকে ওরা মনে করল কাপুরুষতা। গত রাত্রে আচমকা আমাদের সৈন্যবাহিনীর ওপর চকিত আক্রমণ করে। আক্রমণের উত্তরে পাল্টা প্রতিরোধ ও আক্রমণের সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হয়েছে নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

শুধু তাই নয়—জার্মানবাসীদের চোখে ধুলো দেবার জন্য জার্মান সৈন্যদের পোল্যণ্ডের সৈন্যের ইউনিফর্ম পরিয়ে আক্রমণ করা হল স্পেইউইটজ, রেডিও স্টেশনটিকে। ঘটনাটিকে সামনে তুলে ধরে জার্মান প্রচার যন্ত্র মারফৎ জানানো হল, পোল্যাণ্ডের আগ্রাসী আক্রমণকে মোকাবিলা করতে আজ ভোরে জার্মান সৈন্যদের পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। এই অস্ত্র ধরাটাকে এই মুহূর্তেই আমরা যুদ্ধ বলছিনা—এটাকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাল্টা আক্রমণ বলাই শ্রেয় হবে।

যুদ্ধের ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে হিটলার যুদ্ধ চলাকালীন বিপর্যয়ের জন্যও মানসিক ভাবে তৈরী হচ্ছিলেন। সম্ভবত তাই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরসূরীর কথাও তিনি ভেবেছিলেন। যুদ্ধে যদি তার নিজের মৃত্যু ঘটে তাহলে কি হবে সেই ছকও ভেবে রেখেছিলেন

তিনি। তাঁর অবর্তমানে জার্মানীর নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন গোয়েরিং-এর নাম। যদি গোয়েরিং-এর কিছু ঘটে তাহলে দায়িত্ব নেবেন হারমান হেস। আর যদি হেসেরও কিছু ঘটে তাহলে—সে উত্তর হিটলার দেননি। সম্ভবত তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন অজেয় জার্মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন দেশের নেই। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যুদ্ধে জার্মানীর জয় হবে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ওদিকে গোয়েরিং ততক্ষণে সুইডিস ব্যবসায়ী দাহলারেসকেও বুঝিয়ে ফেলেছেন যে যুদ্ধে জার্মানীর কোন ইচ্ছেই ছিলনা। পোল্যাণ্ড আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করল বলেই এমনটা ঘটে গেল। এত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে মিথ্যাকে উপস্থাপন করেছিলেন গোয়েরিং যে দাহলারেস তার কথায় বিশ্বাস করে লণ্ডনের ফরেন অফিসে ফোন করে বলেছিলেন—পোলিশরা শান্তিপ্রস্তাবকে নস্যাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যখন আলাপ আলোচনা চলছে তখন এভাবে জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ করার কোন মানে হয়! আমাদের সমস্ত উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য পোল্যাণ্ডের এই আক্রমণ অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত ছিল।

লণ্ডনের ফরেন অফিসে কাডোগানকে ফোন করে সেদিনই জানিয়েছিলেন দাহলারেস—পোল্যাণ্ডই প্রথম আক্রমণ শানিয়েছে। পোলিশ সৈন্যদের গোলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দিরশা ব্রিজ।

কাডোগান বুঝতে পারছিলেন দাহলারেস এর গলায় জার্মান ভাষ্যই বাজছে। হয়তো তার মগজ ধোলাই জার্মানরা খুব সুনিপুণ ভাবে করেছে তাই এ সমস্ত কথা সে বলছে। খুব ঠাণ্ডা গলায় কাডোগান জানিয়েছিলেন দাহলারেসকে—সব শুনলাম। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। এখন জার্মানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার আর কোন অবকাশ নেই। জার্মান সৈন্যরা এখন পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছে। যুদ্ধ বন্ধের এখন একমাত্র পথ হল জার্মান সৈন্যদের পোল্যাণ্ড থেকে সরে আসা। যতক্ষণ সেটা না ঘটছে ততক্ষণ বহমান ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখা ছাড়া আর কি-ই বা করা যেতে পারে?

যুদ্ধের রণদুন্দুভির সঙ্গে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল কূটনৈতিক তৎপরতা। পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত তাঁর রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী সেদিন সকাল দশটা বাজতে না বাজতে হাজির হয়েছিলেন লণ্ডনে—লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের অফিসে। হ্যালিফ্যাক্স দেখেছিলেন রাষ্ট্রদূত রেসজিনস্কির মুখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

রেসজিনস্কি সেদিন জানিয়েছিলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে জার্মান আগ্রাসনের কথা। শান্তির বাণীর আড়ালে হিটলারের হিংস্র আক্রমণ কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে পোল্যাণ্ডে—সবিস্তারে জানিয়ে তিনি চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব হিসেবে বুঝতে পেরেছিলেন আসলে কি ঘটেছে। কিন্তু তখনি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাননি রেসজিনস্কিকে। শান্ত মুখে তিনি বলেছিলেন, —আপনার সব কথা শুনলাম। বুঝতে পারছি, মিথ্যা প্রচারের আড়ালে কি ঘটনাটা জার্মানী ঘটিয়েছে। কিন্তু আমার করণীয় কিছু কাজ এখনও বাকি। আমার সরকারের তরফের সিদ্ধান্ত তো আমি একা নিতে পারিনা। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন—আপনাকে অবশ্যই যথা সময়ে জানানো হবে।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের তখন খুব ব্যস্ততা। প্রতিটি মূহুর্ত মূল্যবান—প্রতিটি সিদ্ধান্ত চুলচেরা বিচার করে নিতে হবে। এ যেন বারুদের স্তুপের পাশ দিয়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে, যে কোন সময়ে মারাত্মক বিস্ফোরণ চরম অঘটন ঘটাতে পারে। শান্তি এখন দূর-অস্ত। যুদ্ধ এক অনিবার্য ঘটনা। তবু শেষ চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখতে চাননি তিনি।

রেসজিনস্কি চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোনে তলব করেছিলেন জার্মান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স সিয়োডর কোর্ডট্‌কে। সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হ্যালিফ্যাক্স—আপনার কাছে কোন খবর আছে নাকি? জার্মানী নাকি আক্রমণ করেছে পোল্যাণ্ডকে?

কোর্ডট বললেন—এমন কোন খবরতো আমার জানা নেই।

জার্মানী যে আক্রমণ করেছে তাও যেমন আমি জানিনা তেমনি এ রকম পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কাজ সম্পর্কে কোন নির্দেশও আমি পাইনি।

হ্যালিফ্যাক্স এমন উত্তরই আশা করেছিলেন কোর্ডট্-এর কাছ থেকে। মুখে কোন অভিব্যক্তি না এনে তিনি বলেছিলেন—সমস্ত ঘটনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিচ্ছে। আমরা ব্রিটিশ সরকারের তরফে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়—বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলেও মনে করছি।

কোর্ডট্ বার্লিনকে ফোন করেছিলেন সেদিন বেলা এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে,—হ্যালিফ্যাক্স যা বলেছিলেন হুবহু সবটা বক্তব্যই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন ফোনের মাধ্যমে।

হিটলারের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল কোর্ডট্ এর টেলিফোন বার্তা। হিটলার তখনও ভাবছিলেন, এই যুদ্ধে ইংলণ্ড নিশ্চয় জড়িয়ে পড়বে না। গা বাঁচাবার চেষ্টা না থাকলে ব্রিটেনের পক্ষে জার্মান আক্রমণের খবর পেয়েও এতক্ষণ চুপচাপ থাকার কথা নয়। আসলে হিটলার ভাবছিলেন—জার্মান সৈন্যদের পরাক্রমের মোকাবিলা করতে গেলে গ্রেট ব্রিটেনের হাল কি হতে পারে সেটা বিবেচনা করেই হয়তো ব্রিটেন এই যুদ্ধ থেকে সরে থাকবে।

উনিশশো উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর রাত সাতটা পনেরো মিনিটে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে রিবেনট্রপের ঘরের ফোন বেজে উঠেছিল। বার্লিনের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছিল রিবেনট্রপকে, জরুরী আলোচনার জন্য হেণ্ডারসন নিজে দেখা করতে চান।

রিবেনট্রপ জানিয়েছিলেন—বেশ তো। রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসনের সঙ্গে আলোচনায় আমরাও আগ্রহী। তাঁকে রাত ৯টায় আসতে বলতে পারেন।

একটু পরে ফোন এসেছিল ফরাসী দূতাবাস থেকে। ফোন এসেছিল রিবেনট্রপের কাছে। রাষ্ট্রদূত কুঁলদ্রে একই কথা

বলেছিলেন রিবেনট্রপকে--খুব জরুরী প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তাঁকেও জানিয়েছিলেন রিবেনট্রপ—বেশতো আপনার সঙ্গে আলোচনায় আমরাও আগ্রহী। আপনি রাত সাড়ে নটায় আসতে পারেন।

পরিকল্পনামাফিক রিবেনট্রপ দুই রাষ্ট্রদূতকে একই সময়ে দেখা করতে না বলে দু'জনের সাক্ষাতের সময়ের মধ্যে আধঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রেখেছিলেন।

এই সাক্ষাতের আগে পর্য্যন্ত হিটলার থেকে রিবেনট্রপ পর্য্যন্ত সবাই ভাবছিলেন ব্রিটেন এই মুহূর্তে এই যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে জড়াবেনা। ইতিহাসের গতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে আপন আত্মতুষ্টিতে বিভোর বলেই এমন ভাবনা তাদের মনে দানা বেঁধেছিল।

দুই রাষ্ট্রদূত আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করলেও তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের তরফে তাঁরা যে চিঠি তুলে দিয়েছিলেন রিবেনট্রপের হাতে, চিঠির ভাষা ছিল একই রকম। চিঠির ভাষাতে নম্রতা থাকলেও তার ঋজুতা ছিল জার্মানীর কাছে চরম হুঁসিয়ারির মতো। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা ছিল, সম্পূর্ণভাবে এবং স্বেচ্ছায় জার্মানীকে তার সব সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে পোল্যাণ্ড থেকে। যুদ্ধের যে বাতাবরণ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব এখন বর্ত্তিয়েছে শুধুমাত্র জার্মানীর ওপর। যুদ্ধ রোধের এটাই হবে একমাত্র পথ। যদি জার্মানী এই পথ বর্জন করে এবং যুদ্ধের গোলাগুলির অবিরাম গর্জনে শান্তির সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিনাশ করতে উদ্যোগী হয় তাহলে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের কাছে একটি মাত্র পথই খোলা থাকবে। আর তা হল—আক্রান্ত দেশ পোল্যাণ্ডের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী, এইরকম পরিস্থিতিতে পোল্যাণ্ড সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনী।

রিবেনট্রপ চিঠি পড়ে নিয়মমাফিক উত্তর দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, আপনাদের রাষ্ট্রের তরফে পাঠানো চিঠি আমি আমার রাষ্ট্রপ্রধান ফ্যুয়েরার হিটলারের কাছে পাঠিয়ে দেব। তবে একটা কথা আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি—আপনারা এই যে বলছেন না যে জার্মানী আক্রমণ চালিয়েছে—কথাটা কিন্তু একদম মিথ্যা রটনা ছাড়া আর কিছু না। আসল ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য এরকম একটি মিথ্যাকে সুকৌশলে ছড়ানো হচ্ছে। যদি না পোল্যাণ্ডের সামরিক বাহিনী জার্মান বাহিনীকে আক্রমণ করতো তা হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি কিছুতেই হতে পারতো না। আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতি আক্রমণ ঘটেছে। কানে শোনা কথার সঙ্গে বাস্তবে ঘটা ঘটনার অমিলটাও তো চোখে পড়া উচিৎ।

হেণ্ডারসন সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন রিবেনট্রপকে—আচ্ছা পোল্যাণ্ডের তরফে যে প্রস্তাব আপনার কাছে এসেছিল আপনি সেটা বিবেচনা করেছিলেন কি?

রিবেনট্রপ বলেছিলেন শুধু বিবেচনা করাই নয় তার নানা খুঁটিনাটি নিয়েও আমি ওঁদের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আগেও বলেছি এখনও বলছি এই যুদ্ধ আমরা চাইনি—আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিথ্যা প্রচারকে খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করার শিক্ষা ইতিমধ্যে জার্মান সমরনায়করা বেশ ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন। রিবেনট্রপও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলার সময় তাই তিনি অনায়াসে মিথ্যা কথাগুলিকে একসঙ্গে সাজিয়ে নির্বিকার মুখে বলতে পেরেছিলেন।

যে দিন দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রিবেনট্রপ এত কথা বলেছিলেন সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ডের আরও ভেতরের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

রিবেনট্রপের চিঠি হিটলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। চিঠির বক্তব্য থেকে হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন—পোল্যাণ্ড থেকে সরে না এলে ফ্রান্স, গ্রেট-ব্রিটেন এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং সুরু হয়ে যাবে

আর একটি মহাযুদ্ধের। কিন্তু পশ্চাৎ অপসারণের সিদ্ধান্ত তখন মর্যাদার প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছিল। রণমদমত্ত হিটলারের তখন ফিরে আসা ছিল অসম্ভব। জেনারেলদের কাছে হিটলারের নির্দেশ ছিল—পোল্যাণ্ডকে তীব্র আক্রমণে ঘায়েল করতে হবে।

ফ্যাসিস্ত ইটালির ডিক্টেটর মুসোলিনীও খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। জার্মান স্বস্তিক পতাকাবাহিনীর পোল্যাণ্ড অভিযান তার অস্বস্তিকে বাড়িয়ে দিল বিপুল পরিমাণে। তিনি বুঝতে পারছিলেন যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়া মানে জার্মানীর মিত্র হিসাবে ইটালিকেও সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। তিনি মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধ নিরসনের উদ্যোগ নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন হিটলারকে।

হিটলার তার উত্তরে বিনয়ে বিগলিত ভাব দেখিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন মুসোলিনীকে তার প্রতি ছত্রে ছিল ফ্যাসিষ্ট ফুয়েরারের মিথ্যাচার। তিনি লিখেছিলেন, শান্তি উদ্যোগে মধ্যস্থতা করার যে উদ্যোগ আপনি নিয়েছিলেন তার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথম থেকেই যদিও আমি পোল্যাণ্ড সরকারের মতিগতি বুঝতে পেরেছিলাম তথাপি আপনার উদ্যোকে আমি কোন বাধা সৃষ্টি করিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আপনি মধ্যস্থতার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এতে আপনার কোন লাভ হয়তো হবেনা—তবু আপনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম। পোল্যাণ্ড যদি আমাদের আক্রমণ না করতো তা হলে তো কোন কথাই ছিলনা। কিন্তু ওরা যে আমাদের আক্রমণ করতে পারে তা কিন্তু আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম।

তবু হাল ছাড়েননি মুসোলিনী। সিয়ানোকে নিয়ে তিনি তখন নানা পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলেও তার বিস্তৃতি কমানো যায় কিনা তাই ভাবছিলেন দুজনে। সিয়ানোর মাধ্যমে তিনি যোগাযোগও করেছিলেন রোমের দুই ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। তাঁর প্রস্তাব ছিল—ভর্সেইলস-এর চুক্তি নিয়েইতো অশান্তির সূত্রপাত। চুক্তির সর্ততে অপমানিত জার্মানী তার ক্রোধকে আর
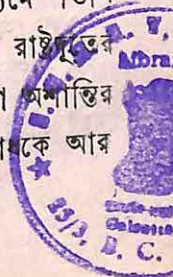
অবদমিত রাখতে পারছেনা। এই অবস্থায় একটা জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করা যাক ৫ সেপ্টেম্বর। সেই সভায় ভার্সাই চুক্তির সর্তগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হয়তো আলোচনার টেবিলে কোন শান্তি প্রস্তাব আমাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

মুসোলিনী যেদিন ৫ই সেপ্টেম্বরের আলোচনা প্রস্তাব উত্থাপন করছিলেন সেই নির্দ্ধারিত দিনটির আগেই ১লা সেপ্টেম্বর যখন জার্মান সেনারা পোল্যাণ্ড সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেল তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন—মুসোলিনীর শান্তি প্রস্তাব সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে গেল। এমনকি মুসলিনী স্বয়ংও তাই মনে করেছিলেন। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর মুসোলিনীর জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। একটি ফোন এসেছিল মুসোলিনীর কাছে। ফোন করেছিলেন ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্র্যান্সিস পোনেত। বেলা তখন এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বিস্মিত মুসোলিনী শুনেছিলেন ফ্র্যান্সিস পোনেত বলছেন—এই ধরণের একটা উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। বেশতো, আলোচনায় বসা যাক না। হয়তো কিছু সুফল পেতেও পারি।

ফরাসীরা মুসোলিনীর উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও ব্রিটিশ সরকারের তরফে অনমনীয় মনোভাব নেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তর বুঝিয়ে ছিলেন ফরাসী পররাষ্ট্রদপ্তরকে—এখন সমঝোতার সময় নেই। আক্রমণ ঘটিয়ে জার্মানী অন্যায় করেছে। আগে নিঃসর্ত ভাবে জার্মানীকে পোল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে—তারপর আলোচনা। আর যদি নিতান্তই তারা রাজি না হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী পোল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হবে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ব্রিটেনের দৃঢ়তার সঙ্গে একমত হতে হয়েছিল ফ্রান্সকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।

১লা সেপ্টেম্বর উনিশশো উনচল্লিশ—ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের তরফে বার্লিনে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল—সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই জার্মান সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে পোল্যাণ্ড থেকে তারা

সরে আসবে। এই ঘোষণা যদি জার্মান তরফে না করা হয় তাহলে এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অংশগ্রহণ করবে।

দুপুরে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ফোন ও বিকেলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের হুঁশিয়ারীতে মুসোলিনী তখন বিচলিত। অবিচল ছিলেন শুধু একজন—হিটলার। পরিকল্পনা মত ছক অনুযায়ী তিনি তখন বোমারু বিমানের আঘাতে একদিকে বিধ্বস্ত করছিলেন পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ড অন্য দিকে তৈরী হচ্ছিলেন আসন্ন যুদ্ধের বিস্তৃত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের বিন্যাসের পরিকল্পনায়। মুসোলিনী এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আবার হিটলারকে অনুরোধ করেছিলেন—আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না।

আরো দু'জন মানুষ তখন গভীরতর উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। তারা হলেন হেণ্ডারসন ও কুলন্ত্রেঁ। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে প্রতি মিনিটে প্রতি ঘণ্টায় তারা সাগ্রহে প্রতিক্ষায় থেকেছেন —যদি হিটলারের তরফ থেকে ইতিবাচক কোন সাড়া পাওয়া যায়— যদি ফরাসী ও ব্রিটিশ হুমকিতে জার্মানী কিঞ্চিৎ নমনীয় ভাব নেয়। কিন্তু মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে প্রহর, বেলা অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি নেমে এলেও হিটলারের তরফে কোন উত্তর তাদের কাছে সেদিন পৌঁছয়নি। হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছেছিলেন ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূত এট্টোলিকো। তিনি জানতে চেয়েছিলেন হেণ্ডারসনের কাছে কি, এটা কি একটি চরমপত্র।

হেণ্ডারসন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমার রাষ্ট্রের তরফে জার্মানীকে যা জানাতে বলা হয়েছে তা আমি জানিয়েছি। চিঠির পূর্ণবয়ান না জানালেও আমি আপনাকে বলতে পারি, আমার রাষ্ট্র কোন চরম পত্র দেয়নি—যা দিয়েছে তা হল হুঁসিয়ারী। তাহলে চরম পত্র নয়। এট্টোলিকো কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। —দেরী হলেও সব আশা এখনও তাহলে শেষ হয়নি। —তিনি ছুটে গিয়েছিলেন রিবেনট্রপের দপ্তরে।

কিন্তু রিবেনট্রপ সেদিন দেখা করেননি এট্টোলিকোর সঙ্গে। শরীর খারাপের অছিলায় তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন সেদিনের সাক্ষাৎকার।

অগত্যা ওয়াইজেকারের হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়েছিলেন এট্টোলিকা। চিঠিটিতে লেখা ছিল—সব আশা এখনও শেষ হয়নি এবং শান্তি উদ্যোগ এখনও কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারে মনে করে ইটালী এখনও ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানীর এক সম্মেলন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করছে। আলোচনার বিষয় অনেক কিছুই হতে পারে। তবে অবশ্যই আলোচনার মধ্যে থাকবে—অস্ত্রসংবরণ ও পোল্যাণ্ড-জার্মান বিরোধের সম্মানজনক মিমাংসা। অস্ত্র সংবরণ করে সৈন্যরা যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকবে। এবং যেহেতু ড্যানজিগ এখন জার্মানীর দখলে সেহেতু জার্মানীর খানিকটা ইচ্ছাপূরণতো ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। মুসোলিনীও মনে করেন, বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য চিঠিটি রিবেনট্রপ ও হিটলারের কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরী।

বেলা দশটায় যে রিবেনট্রপ 'অসুস্থ' বলে এট্টোলিকোর সঙ্গে দেখা করেননি সেই রিবেনট্রপই বেলা সাড়ে বারোটায় আলোচনায় বসেছিলেন এট্টোলিকোর সঙ্গে। কেননা ইটালির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত জরুরী বলে মনে করেছিলেন হিটলার। আগের দিন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তরফে যে চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে যুদ্ধ সমাসন্ন এবং এই যুদ্ধে ইটালিকে পাশে পেতেই হবে।

রিবেনট্রপ সেদিন কিন্তু কোন আশার কথা শোনাননি এট্টোলিকোকে। তিনি বলেছিলেন মুসোলিনী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু গ্রেটব্রিটেন বা ফ্রান্স এই উদ্যোগে যে সাড়া দিতে আদৌ আগ্রহী নয় সেটা তাদের গতকালের চরমপত্র থেকেই বোঝা গিয়েছে।

যুদ্ধ এড়াবার জন্য এট্টোলিকো সেদিন যে পন্থাকে বেছে নিয়েছিলেন তা জার্মান পথ ও পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। জার্মানরা মিথ্যার আশ্রয় নিত তাদের দুরাত্মা ভাবকে আড়াল করে রাখার জন্য আর এট্টোলিকো সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য।

সিয়ানো কোন ফোন না করলেও এট্টোলিকো সেদিন রিবেনট্রপকে বলেছিলেন। সিয়ানো নিজে ফোন করে তাকে বলেছিলেন, ফ্রান্স এখনও শান্তি প্রস্তাবে আগ্রহী। ফ্রান্স রাজি হলে গ্রেট ব্রিটেনও শান্তি প্রস্তাবে রাজি হতে পারে।

রিবেনট্রপের বাঁকা ভ্রূ তবু সোজা হয়নি। তিনি পুরনো প্রশ্নটিকেই আবার নতুন করে উত্থাপন করলেন—জার্মানও ফরাসী তরফে পাঠানো চিঠিটি চরমপত্র কিনা তা আগে জানতে চান হিটলার। এই উত্তর নির্দ্ধারিতভাবে পাওয়া না গেলে নতুন করে কিছু ভাবতে পারছেন না হিটলার। যদি এটি চরম পত্র নয় বলে তারা বলে তাহলে হিটলার অবশ্যই প্রস্তাবটি বিবেচনা করবেন। যাই হোক, এট্টোলিকো এখনই হেণ্ডারসন কুলন্দ্রেঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের চিঠি চরম-পত্র কিনা আগে জেনে নিন। যদি ওরা বলে এটা চরমপত্র নয় তাহলে বৈঠকের বিষয়ও আলোচনা করে নিতে পারেন তিনি।

যদিও হেণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলে এট্টোলিকো আগেই জেনে-ছিলেন যে এটি চরম পত্র নয় হুঁসিয়ারী—তবু সে কথা রিবেনট্রপকে না বলে আবার তিনি ছুটে গিয়েছিলেন হেণ্ডারসনের কাছে। হেণ্ডারসন একই উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে এট্টোলিকো আবার গিয়েছিলেন রিবেনট্রপের কাছে। স্নায়ুর উত্তেজনা তখন তার এত বেশী যে ভাল করে কথা বলতেও পারছিলেন না। হাঁপাচ্ছিলেন ক্রমাগত। তিনি রিবেনট্রপকে বলেছিলেন—হেণ্ডারসন বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এটি চরমপত্র নয়। এটি একটি হুঁসিয়ারী।

রিবেনট্রপ কিন্তু কোন উত্তেজনা দেখাননি। ছক কষে যিনি এগোচ্ছেন তার মধ্যে উত্তেজনা থাকার কোন কথাও ছিল না। তিনি জানিয়েছিলেন এট্টোলিকোকে—যদি ইটালী স্থির নিশ্চিত হয় যে এটা চরমপত্র নয় তাহলে মিত্রকে বিশ্বাস করে জর্মানী উত্তর দেবে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের তরফে পাঠানো হুঁসিয়ারী পত্রের। কিন্তু তার আগে তো একটু ভাবনা চিন্তার জন্য সময়ও দরকার। দিন দুয়েকের মধ্যে

জার্মানীর উত্তর অবশ্যই দেওয়া হবে।

এট্টোলিকো বুঝতে পারছিলেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দু'দিন বড় দীর্ঘ সময়। যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধের বাঁক অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে। তিনি মরিয়া হয়ে রিবেনট্রপকে বলেছিলেন—দু'দিন স্বাভাবিক সময়ে কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অস্বাভাবিক এই অবস্থায় জার্মান উত্তর কি আর একটু তাড়াতাড়ি পাঠানো সম্ভব নয়?

রিবেনট্রপ গভীরভাবে ভাববার ভান করেছিলেন। ফ্রান্স ও জার্মানীর চিঠির অর্থ তার জানা ছিল। চরমপত্র আর হুঁসিয়ারীর তফাৎটা জার্মানীর সমর বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তবু এমন একটা ভাব তারা দেখাচ্ছিলেন যে ওদের তরফে পাঠানো চিঠি চরমপত্র কিনা এই নিয়ে তখনও যেন দ্বিধা ছিল জার্মানীর। আর চরমপত্র না হলে শান্তি বৈঠকে বসতে বা তাদের চিঠির উত্তর দিতে জার্মানীর কোন আপত্তি নেই। রিবেনট্রপ বলেছিলেন এট্টোলিকোকে —আচ্ছা ঠিক আছে। কাল তেশরা। সেপ্টেম্বরেই আমরা চিঠির উত্তর দেব। ইটালী যখন চাইছে তখন জার্মানীও সময়সীমা এগিয়ে নেবে একদিন।
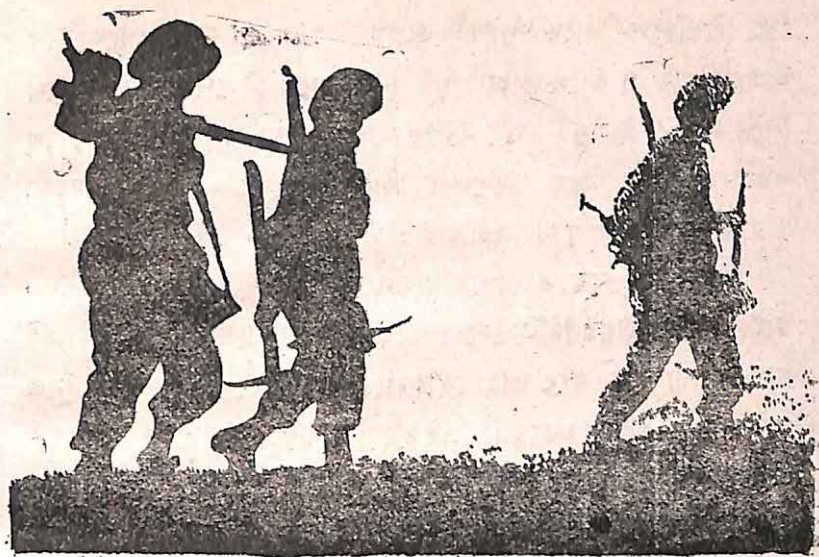
যুদ্ধ যে দিন শুরু হল

উনিশশো উনচল্লিসের ২রা সেপ্টেম্বর রাত সাতটায় মুসোলিনীকে যে খবর পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তর তাতে খুশী হতে পারার মত কিছু ছিল না। ব্রিটেন অনড়ভাবে একটি মাত্র শর্তে শান্তিপ্রস্তাবে রাজি ছিল—আর তা হল, আগে জার্মানীকে পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ড থেকে সরে আসতে হবে। —হিটলার যে এই প্রস্তাবে রাজি হবেনা এটা সকলেই জানতেন। এবং এই অরাজি হওয়া যে যুদ্ধ শুরুর ঘণ্টা ধ্বনির সামিল তাও তারা জানতেন। শান্তির আশার শেষ আলোক শিখাও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তরের এই খবরের পর নির্বাপিত হওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে শীর্ণকায় মানুষটির চোয়াল ক্রমশ শক্ত হচ্ছিল। জার্মানীকে পাঠানো চিঠির উত্তর বাহাত্তর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেঁছয়নি। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের সিদ্ধান্তর ওপর নির্ভর করছিল কবে এবং কখন ইংলণ্ড যুদ্ধে নামবে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে চেম্বারলেন ব্রিটিশ সরকারের তরফে যে

চিঠি দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টতই উল্লেখ ছিল যে পোল্যাণ্ড থেকে যদি জার্মানী সরে না আসে তাহলে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পোল্যাণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ইংলণ্ড। এই চিঠির কোন উত্তর না দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিছক উপেক্ষাই ছিলনা—পরোক্ষে জানান দেওয়া হয়েছিল জার্মানীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

হ্যালিফ্যাক্স বুঝতে পেরেছিলেন আসল ঘটনাটা কি ঘটছে। জার্মানী চিঠির উত্তর দিচ্ছি দেবো করে সময় কাটাচ্ছে। আসলে এই সময়ের সদ্ব্যবহার করে তারা পোল্যাণ্ডের যতটা বেশী ভেতরে ঢুকে পড়া যায় তার চেষ্টা করছে। এইভাবে ডানজিগ সহ বেশ খানিকটা এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসে হিটলার শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আবার আলোচনায় বসতে পারেন। কিন্তু এই সুযোগ জার্মানীকে দিতে রাজি ছিলেন না হ্যালিফ্যাক্স। ফরাসী সরকারকে তিনি জানিয়ে ছিলেন—এখন কালক্ষেপ করার সময় নয়। দুরাত্মার ছলে যদি আমরা ভুলি তাহলে সেই ভুলের খেসারত আমাদের দিতে হবে বিপুল ভাবে। জার্মানীকে চরম পত্র দিয়ে আমরা জানাবো যে তে'সরা সেপ্টেম্বর ভোর ছটার মধ্যে যদি জার্মান সৈন্যরা পোল্যাণ্ড থেকে না চলে আসে তাহলে ব্রিটেন বাধ্য হবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে। গভীর রাতে এই খবর পেয়ে হিটলার যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতেই নির্দ্ধারিত হবে যুদ্ধের গতি।

হ্যালিফ্যাক্স যখন স্থির নিশ্চিত যে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই তখনও দোলাচল চিত্ততায় আচ্ছন্ন ছিলেন ফরাসী জেনারেল গ্যামেলিন ও ফরাসী জেনারেল স্টাফের সমর বিশেষজ্ঞরা। ভয় তাদের ছিল একটাই, আর তা হল জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ক্ষয়ক্ষতি বেশী হবার সম্ভাবনা থাকবে ফ্রান্সেরই। কারণ ব্রিটিশ সরবরাহ যা আসবে সেটাতো পরের কথা—কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মানেই ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী ফ্রান্সকে মুখোমুখি হতে হবে জার্মান আক্রমণের। জেনারেল গ্যামেলিন তাই সেদিন সরাসরি সায় দিতে পারেননি হ্যালিফ্যাক্সের প্রস্তাবে। তিনি বলেছিলেন, এত কম সময়

না দিয়ে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হোক জার্মানীকে। এই সময়সীমার মধ্যেও যদি শান্তির সপক্ষে ইতিবাচক কোন উত্তর না আসে জার্মানীর তরফ থেকে তখন আমরা বাধ্য হয়েই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো।

হ্যালিফ্যাক্সের কাছে খবর পৌঁছানো মাত্রই তিনি প্যারিসের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার এরিক ফিপস্‌কে ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আপনি ফরাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলুন— আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া অসম্ভব আমাদের পক্ষে। জার্মানী আমাদের তরফে পাঠানো চিঠিকে কোন তোয়াক্কাই করছে না। আগের চিঠিরই উত্তর দেয় নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর যে উত্তর দেবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? ফরাসী সরকারের এই দ্বিধাগ্রস্ততা আমাদের বিস্মিত করছে।

হাউস অফ কমন্সও সেদিন উত্তেজনায় উত্তাল। ব্রিটিশ সরকারের তরফে পাঠানো চিঠির কোন উত্তর জার্মানী না দেওয়া সত্বেও এবং সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কেন পোল্যাণ্ডের পাশে গ্রেট ব্রিটেন দাঁড়াচ্ছেনা তাই নিয়ে সদস্যরা উত্তেজিত। এরই মধ্যে হাউস অফ কমন্সে তার ভাষণ দিতে উঠলেন চেম্বারলেন। নতুন কোন কথা তিনি সেদিন সদস্যদের শোনাতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন চিঠি পাঠানো সত্বেও জার্মানী আমাদের কোন উত্তর দেয়নি বা পোল্যাণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণও করেনি। আমরা আবার চরমপত্র দিচ্ছি। ফরাসী সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি। এবারও যদি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে চরমপত্রের কোন উত্তর না পাই তাহলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমাদের করতেই হবে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার পরিপন্থি কোন কিছুই গ্রেট ব্রিটেন মেনে নেবেনা।

হাউস অব কমন্সের সদস্যরা সেদিন নিছক এই কথা শোনার জন্য আসেননি। চেম্বারলেনের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন সদস্যরা।—উনচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল জার্মানী পোল্যাণ্ডের ভেতর ঢুকে আক্রমণ চালাচ্ছে—আর আমরা এখনও শান্তির আশায়

বসে আছি। তীক্ষ্ন শানিত ভাষায় চেম্বারলেনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন একের পর এক কনসারভেটিভ ও লেবার পার্টির সদস্যরা।

এই তীব্র শানিত আক্রমণের মুখে চেম্বারলেনকে বলতে হয়েছিল —আমি সভাকে বিভ্রান্ত করছিনা। এই মুহূর্তে ফরাসী দেশেও আলোচনা চলছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেছে আমরা আর কালক্ষেপ করবো না। আমরা পোল্যাণ্ডের মিত্র হিসাবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো অস্ত্র সম্ভার নিয়ে।

রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিটে হ্যালিফ্যাক্স আবার ফোন করে-ছিলেন ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বনেটকে। তিনি বলেছিলেন—ঠিক আছে, আপনাদের পরামর্শমতো আমরা চরমপত্রের সময়সীমা বাড়িয়ে নিলাম তে'শরা সেপ্টেম্বর সকাল ছ'টার বদলে বেলা বারটা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। কিন্তু চরমপত্রটি পাঠাতে হবে বার্লিনে তেসরা সেপ্টেম্বর সকাল আটটায়।

বিস্ময়ের সঙ্গে হ্যালিফ্যাক্স শুনেছিলেন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কথা। ফোনের রিসিভারে কান দিয়ে তিনি শুনেছিলেন, বনেট বলছেন,—এত তড়িঘড়ি করলে পরিস্থিতি শুধু জটিলই হবে। এখনই চরমপত্র পাঠানোর কোন দরকার নেই। দুপুরের পর অবস্থা বিবেচনা করে চরমপত্র পাঠানোই হবে উচিৎ কাজ।

কিন্তু হ্যালিফ্যাক্স জানতেন আরও সময় দেবার মত সময় তাদের কাছে নেই। আগের দিন হাউস অব কমন্সে উত্তপ্ত আবহাওয়া গিয়েছে। তে'সরা সেপ্টেম্বর দুপুরে আবার সভা বসবে। তখন যদি নির্দ্ধারিত কোন উত্তর দেওয়া না যায় তাহলে সরকার টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। তিনি বনেটকে বলেছিলেন, বাস্তব অবস্থা যা তাতে গ্রেট-ব্রিটেনের পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। ফরাসী সরকার যদি এখনও ব্রিটেনের সঙ্গে ঐক্যমতে না আসতে পারেন তাহলে ব্রিটেনকে তার নিজের সিদ্ধান্ত মতোই কাজ করতে হবে।

তেসরা সেপ্টেম্বর ভোর চারটায় বার্লিনের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত

হেণ্ডারসন পেয়েছিলেম হ্যালিফ্যাক্সের তারবার্তা। তারবার্তাটি জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে সকাল নটার মধ্যে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রবিবারের সকালে হেণ্ডারসন কারো সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। রিবেনট্রপের দপ্তর থেকে বলা হল, রবিবার সকাল ৯ টায় রিবেনট্রপ কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। যদি জরুরী কিছু বার্তা থাকে তবে সেটি তার দপ্তরের ডঃ স্মিডট্‌কে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হেণ্ডারসন তাই করেছিলেন। রিবেনট্রপের জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসে তিনি ঠিক সকাল ৯ টায় গিয়ে দেখা করেছিলেন স্মিডটের সঙ্গে। সৌজন্য বিনিময়ের পর সেদিন হেণ্ডারসন চেয়ারেও বসেননি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মিডটকে শুনিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের তরফে পাঠানো চরমপত্র। বার্তার একটি প্রতিলিপি স্মিডট্‌-এর হাতে তুলে দিয়ে চলে এসেছিলেন হেণ্ডারসন।

স্মিডটও কালবিলম্ব করেননি। হেণ্ডারসনের দেওয়া চরমপত্রটি নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন জার্মান চ্যান্সেলিয়ারিতে। সেখানে তখন সমর বিশেষজ্ঞরা সব উন্মুখ হয়েছিলেন স্মিড্‌ট-এর সঙ্গে হেণ্ডারসনের কি কথাবার্তা হল জানবার জন্য। স্মিডটকে সরাসরি হিটলারের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হিটলারের ঘরে ঢুকে স্মিডট্‌ দেখেছিলেন, হিটলার চেয়ারে বসে। একটু দূরে জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিবেনট্রপ। হিটলার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন স্মিডট্‌-এর দিকে। স্মিডট্‌ হিটলারকে জার্মান ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন ব্রিটেনের তরফে পাঠানো চরমপত্রটির ভাষা। অপলক তাকিয়েছিলেন হিটলার। রিবেনট্রপের দৃষ্টিও ছিল স্থির।

বেশ খানিক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলেন হিটলার। রিবেনট্রপও কোন কথা বলছিলেন না। বেশ খানিক্ষণ সময় কাটার পর হিটলার প্রশ্ন করেছিলেন রিবেনট্রপকে ; শুনলেন তো সব। এখন কি করব ?

রিবেনট্রপ এক মুহূর্ত সময়ও নেননি উত্তর দিতে। আপনি

একঘণ্টার মধ্যে আরো একটি চিঠি পাবেন ফরাসী সরকারের তরফ থেকে। দেখবেন একই বয়ান থাকবে সেই চিঠিতে।

সকলেই যখন শান্তির আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখনও নিরাশ হননি শুধু একজন। সুইডিস ব্যবসায়ী দাহলারেস। যুদ্ধ এড়াবার জন্য তখনো তিনি চেষ্টা করছিলেন নিরলস ভাবে। তিনি সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন গোয়েরিং-এর কাছে। তাকে বলেছিলেন, ব্রিটিশ চরমপত্রের উত্তর যাতে একটু নমনীয় ভাবে জার্মান তরফে পাঠানো হয় সেটা একটু দেখবেন অনুগ্রহ করে। সব থেকে ভাল হয় যদি ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং স্বয়ং এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য বেলা এগারোটা নাগাদ লণ্ডন রওনা হয়ে যান।

দাহলারেস শুধুমাত্র গোয়েরিং-এর সঙ্গে কথা বলেই থেমে থাকেন নি। লণ্ডনের ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তরে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, ব্রিটিশ চরমপত্রের উত্তর নিয়ে জার্মান তরফে দূত রওনা হচ্ছে লণ্ডনে।

দাহলারেস-এর উদ্যোগ আন্তরিক হলেও কূটনৈতিক কুশলতা না থাকায় রাজনীতির ছলাকলা তিনি বুঝতে পারেন নি। যদি পারতেন তাহলে তিনি যুদ্ধ শুরুর প্রাক্ মুহূর্তে শান্তির এই দূতিয়ালি যে সম্পূর্ণ অর্থহীন তা ধরতে পারতেন।

হঠাৎ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে রিবেনট্রপ দুঘ'ণ্টা আগে হেণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করতে চান নি। তিনি নিজেই উদ্যোগ নিলেন তেসরা সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় হেণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করতে। অবশ্য এই দেখা হওয়ার ঘটনায় ঐতিহাসিক কোন গুরুত্ব নেই। কারণ রিবেনট্রপ যা বলেছিলেন হেণ্ডারসনকে তা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তর অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। রিবেনট্রপ বলেছিলেন, ব্রিটিশ চরমপত্রটি গ্রহণ বা পত্রটির ইচ্ছাপূরণে জার্মান সরকার অক্ষম।

রিবেনট্রপ ও হিটলার এর পর বসেছিলেন প্রচারের ভাষা ঠিক

করতে। দেশবাসী তথা বিশ্বজনকে ভাঁওতা দিয়ে উত্তেজিত করে তোলার পথ ও পন্থাকে পাথেয় করেছিলেন তারা। জার্মান প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সেদিন প্রচার করা হয়েছিল—শান্তির সৎ ইচ্ছাকে পদদলিত করে জার্মান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে পোল্যাণ্ড। পরিকল্পিত ভাবে অলক্ষ্য থেকে চাবিকাঠি নেড়েছে গ্রেটব্রিটেন। পৃথিবীর মানুষকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবার জন্য ভাবীকালের মানুষ ধিক্কার জানাবে ব্রিটেনকে। জার্মানী চায়নি—তবু নিতান্ত নিরুপায় ভাবেই এই যুদ্ধে তাকে জড়িয়ে দেওয়া হল।

বার্লিনের কেউ তেসরা সেপ্টেম্বর রবিবারের সকালেও ভাবতে পারেনি যে হিটলার জার্মানীকে এই মহাযুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছেন। রবিবার অনেকে পিকনিকে আমোদে মত্ত। বেলা বারোটা নাগাদ জার্মান চ্যান্সেলারীর সামনে রাখা কয়েকটি লাউডস্পিকার হঠাৎ বেজে উঠল। গমগমে গলায় ঘোষক জানালেন। গ্রেট ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যারা খবরটা শুনেছিলেন তারা থতমত হয়ে গিয়েছিলেন। লাউডস্পিকারের ভেসে আসা কথা শুনে। খবরের কাগজের বিশেষ বুলেটিনও পরিকল্পিতভাবে তৈরী করে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বুলেটিন জার্মান জনসাধারণের কাছে প্রচার করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল।

ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে
ফুয়েরার আজই অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিদর্শনে যাচ্ছেন

ফরাসী চরমপত্রটিও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে। রাষ্ট্রদূত কুলদ্রেঁর মাধ্যমে পাঠানো ফরাসী চরমপত্রটি পাঠানো হয়েছিল তেসরা সেপ্টেম্বরের বিকাল পাঁচটায়। বলা হয়েছিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটার মধ্যে জার্মান সৈন্যদের পোল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসতে হবে।

হাউস অব কমন্সে চেম্বারলেন বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন বারটা

বেজে দশ মিনিটে! তেসরা সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেছিলেন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে—বৃটেন বাধ্য হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের সকলের কাছে, বিশেষ করে আমার নিজের কাছে আজকের দিনটি গভীর দুঃখের। আমি যা কিছু বিশ্বাস করতাম, যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে আমি বড় হয়েছি সেই বিশ্বাসকে আজ ধ্বংস করা হয়েছে। বিধ্বস্ত বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারছি, আমার করনীয় কাজ এখন একটাই আমার যা শক্তি আছে তা দিয়ে বিজয়কে আমাদের অর্জন করতে হবে। আমাদের হয়তো এর জন্য অনেক মূল্যও দিতে হবে। আশাকরি আমি সেদিনও বেঁচে থাকবো যেদিন পৃথিবী হিটলারী বর্বরতা মুক্ত হবে। যেদিন স্বাধীন ইউরোপ আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

হোয়াইট হাউসের তখতে এসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান চাইছিলেন এমন এক মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে যার ভয়ঙ্করতা দ্রুত যতি টানবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। প্রস্তুতি চলছিল উনচল্লিশ সাল থেকেই। চল্লিশ পার হয়ে একচল্লিশ সাল সুরু হয়ে গেলেও তেমন মারাত্মক মারনাস্ত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান।

সুখবরটা পৌঁছে দিলেন স্টিমসন—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের যুদ্ধ বিষয়ক সচিব। স্টিমসন জানালেন—প্রতিক্ষার অবসান ঘটেছে। মারাত্মক মারনাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এখন শত্রুর ওপর আঘাত হানা যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কয়েকসপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে পাঠানো হল মারাত্মক বোমাটির নানা খুটিনাটি খবর। সেই সঙ্গে পেঁছাল বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ—নতুন বোমাটি জাপানের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হোক। জাপানের সামরিক শক্তির মেরুদণ্ডে এই বোমাই পারবে মোক্ষম আঘাতটি হানতে।

প্রস্তুতি অনেক আগেই সুরু হয়েছিল। বিমান বাহিনীর পাঁচশো নয়তম আক্রমণ বাহিনীকে নানা ধরণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। নিয়মিতভাবে তাদের বোমা ফেলতে বলা হয়েছিল রোটা, গুগুয়ান, মারকান প্রভৃতি নানা জায়গায়। নিশানা অভ্রান্ত রাখার জন্য এই অভিযানগুলোকে সংগঠিত করা হয়েছিল। পাঁচশো থেকে হাজার পাউণ্ডের বোমা নিয়ে বোমারু বিমানে বৈমানিকরা যাত্রা করে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বোমা ফেলে চলে আসতেন। তারা কেউই জানতেন না—কোন ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের সফল প্রয়োগের জন্য তাদের এই বিশেষ অভিযানে পাঠানো হচ্ছে।

জাপানের জনঅধ্যুসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কিয়েটো নাগাসিকি, হিরোসিমা, জিলগাটা ও কোকুরা। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কিয়োটার

নাম কেটে নাগাসিকির নাম বসালেন। এরপর সুরু হল এই চারটি সহরের ওপর লক্ষ্য রাখা ও এদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। সঙ্গে সঙ্গে চলল বৈমানিকদের প্রস্তুত করে তোলার প্রস্তুতি পর্ব। এক এক হাজার পাউণ্ডের বদলে দশ হাজার পাউণ্ডের বোমা ব্যবহার করতে দেওয়া হল তাদের।

পাঁচশো নয় বিভাগের বৈমানিকেরা তাদের কাছে চমৎকার কুশলতা প্রদর্শন করেছিলেন। নীল আকাশের বুক চিরে অতর্কিতে লক্ষ্যে আঘাত হানতে তাদের জুড়ি ছিলনা। একশো পাউণ্ডই হোক আর হাজার পাউণ্ডের বোমাই হোক। নির্ভুল নিশানায় এবং অনায়াস অবহেলায় তাঁরা তাদের কাজ শেষ করতেন। এ সবটাই চেয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং বিমানবাহিনীর প্রধানেরা। জাপানকে খতম করবার পরিকল্পনায় এটা ছিল তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

পাঁচশো নয় বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর পেঁাছানোর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খবর যাওয়ার উচিৎ ছিল বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে। কিন্তু এবার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা গেল। সব খবর পেঁাছে দেওয়া হচ্ছিল জেনারেল লে মে এর কাছে। খবর পেঁাছানো মাত্র লে মে এর যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ভরা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো আনন্দে। পরিকল্পনামতো কাজের শেষে সাফল্য যে দরজায় এসে কড়া নাড়তে সুরু করেছে—কান পেতে তিনি যেন তা শুনতে পেতেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা সত্বেও জাপানে বিমান আক্রমণের সময় পাঁচশো নয়কে ব্যবহার করা হল না। এবং বিস্ময়ের কথা অন্য সব বিমানের থেকে পাঁচশো নয় এর বৈমানিকদের আলাপ করে নেবার জন্য তাঁদের বিমানে বিশেষ চিহ্নেরও ব্যবস্থা করা হল। কালো একটি বৃত্তের মধ্যে একটি কালো তীর বিঁধে আছে এই চিহ্ন সব বিমানের গায়ে এঁকে দিয়ে যেন এদের অভ্রান্ত নিশানার কথাই জানানো হল। যেখানে এই যুদ্ধ বিমানগুলি রাখা হত তার চারদিকেও নেওয়া হয়েছিল

অভূতপূর্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কাঁটাতার দিয়ে চারপাশে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। অজস্র বৈজ্ঞানিক ও কুশলী কারিগরকে রাখা হয়েছিল তার পাশেই—প্রয়োজনমত বিমানগুলিতে বিশেষ কোন বোমা পেঁাছে দেবার জন্য।

গোপনতা এত বেশী ছিল যে পাঁচশো নয়-এর বৈমানিকেরাও ঘুণাক্ষরে জানতে পারেননি—কেন ওদের যুদ্ধবিমানগুলিকে বিশেষ ভাবে বৃত্ত আর তীর দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে—কেনইবা তাদের নানা রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তারা শুধু জানতো বিশেষ একটি বোমা ফেলার জন্য তাদের তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু কি সেই বোমা—তার ক্ষমতাই বা কতটা এসম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের ছিলনা। এমনকি যে কুশলী কারিগর ও প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করছিলেন তাঁরাও যার যার কাজ নিয়ম মতো করে গেলেও তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—যে যে কাজই কর না কেন—অন্য কাউকে সেই কর্ম সম্পর্কে কোন কথা বলবেনা।

তুজিয়েন এর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে যে বোমাটিকে রাখা হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিটল বয়'। বোমাটি তৈরী হয়েছিল কিন্তু অন্যান্য বোমার মত এটি ফাটিয়ে দেখা হয়নি এর শক্তি কতটা। পরীক্ষিত না হলেও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে এই 'লিটল বয়' অসম্ভব শক্তিশালী এক আঘাত হানবে শত্রু শিবিরে—ফাটার মুহূর্তেই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে এক ভয়াবহ ধ্বংসের ভয়।

উনিশশো বেয়াল্লিশের ষোলই জুলাই বৈজ্ঞানিকেরা জানালেন আরো একটি বোমা তৈরী করা হয়েছে। এই বোমাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ফ্যাট ম্যান'। নতুন এই 'ফ্যাট ম্যানটি' 'লিটল বয়' এর চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও সেক্রেটারি স্টিমসনের কাছে খবরটা পেঁাছে দেওয়া হয়েছিল—'লিটল বয়' এর চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী 'ফ্যাট ম্যান' তৈরী হয়ে গিয়েছে। এখন নির্দেশ পেলে শত্রু শিবিরে সাফল্যের সঙ্গে এই বোমার আক্রমণ ঘটানো যেতে পারে। পটাসডাম

কনফারেন্স চলাকালীন এই খবর পেয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আর সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। তিনি জাপানকে সরাসরি জানালেন— হয় তোমাদের আগ্রাসী নীতি ত্যাগ করতে হবে নয়তো ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অবস্থার মুখোমুখি হওয়াই হবে তোমাদের নির্ধারিত নিয়তি। ছাব্বিশে জুলাই জাপানকে সরকারীভাবে জানানো হল—হয় নিঃসর্ত্ত-ভাবে আত্মসমর্পণ কর—অথবা ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি হও।

বৈমানিক কর্ণেল টিবেটকে জিজ্ঞাসা করা হল—পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন কে? প্রশ্নটা এসেছিল বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে।

কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে টিবেট বলেছিলেন—'আমার মা, এনোলা গে।'

বিস্মিত টিবেট ভাবছিলেন, যুদ্ধের রণভেরী যখন সারা পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে ভারী করে রেখেছে—এবং যে যুদ্ধে সে নিজেও অংশীদার হওয়ার ফলে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে অবধারিত সত্য—সেই তাকে কেন এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে?

টিবেটকে আরো বলা হয়েছিল—আমরা জানি পাঁচশো নয় স্কোয়াড্রনের সব বৈমানিকেরাই কুশলী। কিন্তু কোন কাজে তোমাকে স্কোয়াড্রন এর নেতৃত্ব দেওয়া হলে সাথী হিসাবে কাকে তুমি পাশে পেতে চাও?

—ক্যাপ্টেন রবার্ট লুইসকে। এক মিনিটও ভাববার সময় নেননি কর্ণেল টিবেট।

পরদিন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিলেন কর্ণেল টিবেট যে, তার বিমানের গায়ে লিখে দেওয়া হয়েছে তাঁর মা 'এনোলা গে' এর নাম। সাথী হিসাবে বিশেষ অভিযানে তিনি যে ক্যাপ্টেন লুইসকে পাবেন তার প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্রও তিনি পেয়ে গেলেন হাতে হাতে।

ঠিক হল, 'এনোলা গে'-এর ঠিক পিছনে থাকবে বি-২৯ বোমারু বিমান, এই বিমানে থাকবে ক্যামেরা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম, ক্যামেরায়

ধরে নেওয়া হবে বোমা ফাটার পরের ঘটনাবলী। 'এনোলা গে' এর আগে যাবে তিনটি সুপারফোর্ট বিমান, তারা আবহাওয়ার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কারণ অনুকুল ও পরিষ্কার আবহাওয়া ছাড়া সঠিক নিশানায় বোমা ফেলা অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পঁয়তাল্লিশ সালের দোশরা আগষ্ট। জাপানের বিরুদ্ধে বোমাটি ব্যবহার করা হবে এই নির্দেশনায় সই করলেন লেপ্টেনেন্ট জেনারেল নাথান টুইনিং। নির্দেশে বলা হল— বোমাটি নিক্ষেপ করা হবে হিরোসিমায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে কোকুরা বা নাগাসিকি যেখানেই আবহাওয়া অনুকুল থাকবে সেখানেই বোমাটি ফেলা হবে। বোমা নিক্ষেপের সময় মাটি থেকে বিমানের উচ্চতা থাকবে আঠাশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার ফিট। বিমানটির গতি থাকবে ঘণ্টায় দুশো মাইল। ছয়ই আগস্ট বোমাটি নিক্ষেপ করা হবে।

৪ঠা আগষ্ট বৈমানিকদের শেষ মুহূর্তে নির্দেশাবলী দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। মানসিক ভাবে তাদের প্রস্তুত ও চাঙ্গা করে তোলার জন্য তাদের অলামেগার্ডোর বোমা বিস্ফোরণের চিত্র দেখানো হল। তারপর তাদের জানানো হল, যে বিশেষ বোমাটি নিক্ষেপের জন্য তারা আর কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হবে সেটি কুড়ি হাজার টন টি. এন. টি শক্তি সম্পন্ন।

বৈমানিকদের কিন্তু জানানো হয়নি যে তাঁরা যে বোমাটি নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন সেটি একটি আনবিক বোমা। তারা ভেবেছিলেন এই বোমাটিও অন্য বোমাগুলোর মতই—শুধু তফাৎ হল এই যে এটি অনেক বেশীগুণ শক্তিশালী। প্রতিটি বৈমানিকদের পোলারয়েড চশমা দেওয়া হল—যাতে বিস্ফোরণের পর তীব্র আলোর ঝলক দেখা দিলে তাদের চোখের কাঁচ কালো গগলসের মতো পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে তাদের চোখকে রক্ষা করতে পারে। বৈমানিকরা আর পাঁচটা

অভিযানের মতই তাঁদের গন্তব্য পথ, কত উচ্চতা উড়তে হবে, কি রকম আবহাওয়ায় বোমা ফেলতে হবে এসব নির্দেশও পেয়ে গেলেন। শুধু একটি কথা তাদের বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছিল—বোমাটি ফেলে কেউ আর ঘুরে দেখোনা কি ঘটল—যত জোরে সম্ভব সেখান থেকে উড়ে দূরে চলে যেতে হবে। এবং পরিষ্কার আবহাওয়া ছাড়া বোমাটি যেন কোন ভাবেই নিক্ষেপিত না হয়—সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

•

পাঁচই আগষ্ট কর্ণেল টিবেটের কাছে নির্দেশ গেল—'এনোলা গে'-কে একটু উড়িয়ে পরখ করে দেখ সব কিছু ঠিকমতো চলছে কিনা!

'এনোলা গে' সেদিন আকাশের বুক চিরে যখন উড়ছিল তখন তার চালক কর্ণেল টিবেট, তাঁর সাথী রবার্ট লুইস বা যাঁরা বিমানটিকে উড়তে দেখেছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন, আর পাঁচটি যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে 'এনোলা গে'র কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু বিস্তর তফাৎ ঘটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। আকাশ থেকে নেমে এসে যেখানে 'এনোলা গে' এসে দাঁড়াল তার কাছাকাছি রাখা হয়েছিল 'লিটল বয়কে'। পাঁচ টন ওজনের বোমাটি হাইড্রলিক জ্যাক দিয়ে তুলে দেওয়া হল। প্রস্তুতি পর্ব তখন শেষ। অপেক্ষা ছিল শুধু যাত্রা শুরুর।

গভীর রাতে ডেকে পাঠানো হল 'এনোলা গে' সহ সহযাত্রী অন্যান্য বোমারু বিমানের বৈমানিকদের। তাদের জানানো হল, বিশেষ অভিযানের প্রস্তুতি শেষ। এবার তাদের যাত্রার পালা।

রাতের আকাশে তখন মিটিমিটি তারা। কর্ণেল টিবেট একবার চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, এইরকম পরিষ্কার আবহাওয়াই তিনি চেয়েছিলেন। বৈমানিকদের জানিয়ে দেওয়া হল—যদি কোন

অঘটন ঘটে, যদি আকস্মিকভাবে ঘটে যায় কোন দুর্ঘটনা তাহলে তাদের রক্ষা করার জন্য সমুদ্রে এবং স্থলে কি কি ব্যবস্থা কোথায় নেওয়া হয়েছে।

তারপর আর কোন নির্দেশ নয়—তাদের দেওয়া হল প্রাতরাশ। গভীর রাতের প্রাতরাশ বৈমানিকেরা বেশ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রপেলারে শব্দ তুলে রওনা হল আবহাওয়া সম্পর্কিত খবর নেবার জন্য তিনটি সুপার ফোর্ট। বলা হল, 'এনোলা গে' তার যাত্রা শুরু করবে রাত দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

'এনোলা গে'র সামনে রাত দুটোর সময় এসে দাঁড়ালেন বিমানটির পাইলট কর্ণেল টিবেট, সহ পাইলট রাবার্ট লুইস, মেজর টমাস ও ডব্লিউ ফেরেবি, নাভিগেটর জে-ভিন-কার্ক, রেডার বিশেষজ্ঞ লেফটেনেণ্ট জেকব, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার মাষ্টার সার্জেণ্ট প্রভৃতি।

যাত্রা শুরুর মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর ক্যামেরাম্যানরা 'এনোলা গে'র ছবি তুলে নেন। ছবি তোলা শেষ হলে বৈমানিকরা একে একে সিঁড়ি বেয়ে 'এনোলা গেতে' উঠলেন। পাইলটের আসনে দেখা যাচ্ছিল কর্ণেল টিবেটকে। উপস্থিত সবার দিকে হাত নেড়ে কর্ণেল টিবেট বিমানে ষ্টার্ট দিলেন। চার ইঞ্জিনের বিমানটি তুমুল শব্দ তুলে চলতে শুরু করল। রাত দুটো পঁয়তাল্লিশে 'এনোলা গে' তার যাত্রা শুরু করল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি যুদ্ধ বিমানের প্রপেলারে শব্দ উঠল। 'এনোলা গে'র পেছন পেছন রওনা হল 'গ্রেট আর্টিষ্ট' নামে বিমানটি। এই বিমানের আরোহীদের কাজ ছিল 'এনোলা গে' থেকে বোমা ফেলার পরবর্তী অবস্থান ক্যামেরার ছবিতে ধরে রাখার।

'এনোলা গে' যখন জাপানের দিকে উড়ে চলেছে। 'লিটল বয়'কে তখন পুরোপুরি নিক্ষেপের উপযোগী করা হয়নি। কেননা অতীতে এইরকম বোমা ফেলতে গিয়ে কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তাই

আগে থেকেই স্থির করা হয়েছিল যে 'এনোলা গে' যখন আকাশে উড়বে তখন সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই "লিটল বয়" এর যন্ত্রপাতি লাগানো, কলকব্জা, ফিউজ লাগাবার কাজ সারবেন পারসন ও জেপসন। চূড়ান্ত কানেকসন করে পারসন ও জেপসন জানালেন কর্ণেল টিবেটকে যে বিস্ফোরণের জন্য বোমাটি প্রস্তুত। এখন যে কোন মুহূর্তে বোমাটিকে নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

'এনোলা গে' যখন আইওয়া এসে পেঁছিল তখনই কর্ণেল টিবেট তাকালেন অলটিচুড সিবিরের দিকে। সঠিক উচ্চতায় উঠে পরিষ্কার আবহাওয়ায় বোমাটি নিক্ষেপ করতে। চরম মুহূর্ত এসে গিয়েছে। 'এনোলা গে' একটা গোঁত্তা খেয়ে সঠিক উচ্চতায় উঠতে সুরু করল। বোমা কোথায় ফেলা হবে—নাগাসাকি কিংবা হিরোসিমায়—সে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব ছিল কর্ণেল টিবেটের। সামনে আগুয়ান আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া যুদ্ধ বিমানের কাছ থেকে পরিষ্কার আবহাওয়ার খবর পেলেই বোমাটি নিক্ষেপ করার জন্য তখন প্রস্তুত কর্ণেল টিবেট।

বেলা আটটা বেজে পনেরো মিনিটে টিবেটের কাছে রেডিও মেসেজ এল অগ্রবর্তী আবহাওয়ার খবরাখবর নেওয়া বিমানের কাছ থেকে। হিরোসিমার খবর পাওয়া গিয়েছে। চমৎকার পরিষ্কার আবহাওয়া। কর্ণেল টিবেটের চিবুক দৃঢ় হয়ে উঠল। হি-রো-সি-মা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন কর্ণেল টিবেট মুহূর্তের মধ্যে। তাহলে হিরোসিমাতেই ফেলা হবে 'লিটল বয়'কে।

জনবহুল হিরোসিমা ছিল জাপানের এক বড় সামরিক ঘাঁটি। এই সহরেই ছিল জাহাজ তৈরীর কারখানা, তেলের মজুতখানা, খাদ্য সংরক্ষণের গুদাম। কর্ণেল টিবেট যখন হিরোসিমার দিকে উড়ে চলেছিলেন তখন তাঁর সহযাত্রীরা জানতেন না কি ঘটতে চলেছে। তাদের কেউ তখন আয়াস করে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন, কেউ কিছু পড়ছিলেন, কেউ কেউ জানালা দিয়ে ভাসমান মেঘমালা দেখছিলেন। তাদের মনের গহনে ছিল একটি চিন্তা—ধূসর রঙের কোন বোমা তারা

বয়ে নিয়ে চলেছেন ? কেনইবা এই বোমাকে নিয়ে এত গোপনীয়তা, এত সতর্কতা ?

কর্ণেল টিবেট পাইলটের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সহযাত্রীদের সামনে দাঁড়ালেন। সহ পাইলট-রবার্ট লুইস তখন 'এনোলা গে'কে উড়িয়ে নিয়ে চলছিলেন। কর্ণেল টিবেট খুব শান্ত ভঙ্গিতে সহযাত্রীদের জানালেন তাঁকে দেওয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী। তিনি একথা জানালেন যে তাঁর ওপর নির্দেশ আছে বোমাটি নিক্ষেপ করেই সেখান থেকে দূরে চলে যাওয়ার এবং পেছন ফিরে আর কিছু না দেখার। সহযাত্রীদেরও তা-ই করতে তিনি পরামর্শ দিলেন।

কথা শেষ করে কর্ণেল টিবেট তাঁর পাইলটের আসনে ফিরে গেলেন। আর তখনি উঠে দাঁড়ালেন পারসন। তিনি সোজা ধূসর রঙের বিরাট আকারের বোমাটির কাছে গিয়ে সব খুঁটিনাটি আরো একবার দেখে নিলেন। অসীম আকাশে চলমান বিমানের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে সব কিছু দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন।

সবাইকে বলে দেওয়া হল বোমা ফেলার সংকেত দেওয়া হলেই সকলে যেন তাদের পোলারয়েড কালো চশমা সঙ্গে সঙ্গে চোখে দিয়ে নেন। হিরোসিমা থেকে যখন মাত্র বারো মাইল দূরে 'এনোলা গে' এসে পৌঁছালো তখন উঠে দাঁড়ালেন ফেরেবি। বোমাটি নিক্ষেপের দায়িত্ব ছিল তারই।

হিরোসিমার ঘড়িতে স্থানীয় সময় যখন আটটা পনের ঠিক তখনই ফেরেবি বোমাটি হিরোসিমা সহরের বুকে ফেলে দিলেন। এতক্ষণ 'এনোলা গে' তে ক্রমাগত যে সংকেতধ্বনি বাজছিল হঠাৎ সেটা থেমে গেল। বোঝা গেল যার জন্য এত গোপনীয়তা এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশেষে সেই বোমাটি হিরোসিমা সহরে ফেলা হয়েছে। 'এনোলা গে' তখন একত্রিশ হাজার ছয়শো ফিট উচ্চতায় ঘণ্টায় তিনশো আঠাশ মাইল বেগে উড়ে চলেছে। 'এনোলা গে'কে তাড়া করার মত কোন

শত্রুপক্ষের বিমান কর্ণেল টিবেটের চোখে পড়েনি। গগলস্ চোখে চুপচাপ বসেছিলেন যুদ্ধ বিমানের সহযাত্রীরা।

বোমাটি নিক্ষেপের একমিনিটেরও কম সময়ে বিস্ফোরণ ঘটল। ততক্ষণে কর্ণেল টিবেট ডান দিকে প্রচণ্ড বাঁক নিয়ে 'এনোলা গে' কে ঘুরিয়ে দিয়েছেন অন্য দিকে। এই দুরূহ বাঁক নেওয়ার ব্যাপারটা তাকে বারবার অনুশীলন করে আয়ত্ব করতে হয়েছে।

হিরোসিমার দু'লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষের কাছে তখন অন্য যে কোন দিনের মতই একটি নির্মল সকাল অপেক্ষা করছিল, তারা কেউ ভাবতেও পারেননি—একটি বিমান একটু পরেই কি এক সর্বনাশা ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারে শহরটিতে।

সহরবাসিরা সচকিত হয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেননা সহসা সেই সাতসকালে বেজে উঠেছিল শত্রু বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি। উৎকণ্ঠিত মানুষেরা দেখেছিলেন এক ঝাঁক যুদ্ধ বিমান হিরোসিমার ওপর দিয়ে উড়ে গেল কিন্তু কোন বোমা বর্ষণ করলো না। আসলে এগুলো ছিল কর্ণেল টিবেটের 'এনোলা গে'র আগে আগুয়ান আবহাওয়া সম্পর্কে খবরাখবর নেবার বিমান। একটু পরে বেজে উঠেছিল স্বস্তির সংকেত—যার অর্থ হল, আর ভয় নেই শত্রু বিমানগুলো চলে গিয়েছে।

যে যার মত কাজ করছিলেন। কাজে যাচ্ছিলেন, ঘরে ঘরে তখন গোছগাছ চলছে। অজানা এক আশঙ্কায় তখন হিরোসিমার মানুষেরা আতঙ্কিত। যুদ্ধের যা গতি এবং যে হারে বিমান আক্রমণ ঘটছে তাতে যে কোন সময়েই হিরোসিমাও আক্রান্ত হতে পারে—একথা তারা জানতেন। নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার প্রস্তুতি তাই চলছিল পুরোদমে।

'এনোলা গে' কখন হিরোসিমায় উড়ে এসেছিল তা ঠিক ঠাহর করতে পারেননি হিরোসিমার বাসিন্দারা। এমন কি বিমানের শব্দও তারা ঠিক মতো শুনতে পাননি। হঠাৎ শতসূর্য্যের ঝলকানিতে ভরে উঠল হিরোসিমার ওপরের আকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম

এ্যাটম বোমা ফাটা মাত্র আকাশকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মত নিচের দিকে প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়েছিল।

মুহূর্তে বাতাসের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসে তখন আগুনের হল্‌কা, ধূলোয় মিশে গেল হাজার হাজার বাড়ি, হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, চতুর্দিকে তখন আগুনের লেলিহান শিখা, আগুন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত শহরজুড়ে। মুহূর্তে হিরোসিমা শহরের ৪.৭ বর্গমাইল এর সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হিরোসিমা শহরের একাত্তর হাজার তিনশো উনআশীজন মানুষ কোন কিছু বুঝবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় একই সংখ্যার মানুষের গায়ে তখন পোড়া চিহ্ন। শরীরের নানা জায়গায় তাদের পোড়া বড় বড় ফোস্কা। চতুর্দিকে আর্ত্তনাদ।

'এনোলা গে' থেকে বোমাটি নিক্ষেপ মাত্র সকালের সূর্য্যের ঝকমকে আলোর মধ্যেও হঠাৎ আলোর এক ঝলকানী দেখতে পেয়েছিলেন বিমানের অন্য সহযাত্রীরা। জানালার ধারে, চোখে কালো চশমা লাগিয়ে তারা দেখেছিলেন প্রথমে একটা বেগুনে আভা। তারপর সেই আভা পরিবর্তিত হয়ে গেল টকটকে লাল রং-এ। আট হাজার ফুট ওপরে মেঘের মতো সেই লাল টকটকে আলো ক্রমে আরো প্রসারিত হচ্ছিল। মুহূর্তে সেই আগুন রং এর ভাসমান মেঘ অন্তত কুড়ি হাজার ফুট ওপরে উঠে এল। পর মুহূর্তেই যেন একলাফে সেটা চল্লিশ হাজার ফুট উপরে উঠে এসে হিরোসিমা সহরের ওপরে এক আগুনে মেঘের আকার নিল।

'এনোলা গে' যুদ্ধ বিমানের একদম পিছনের সারিতে বসে সার্জেন্ট ক্যারন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন সব কিছু। তিনি দেখেছিলেন বোমাটি নিক্ষেপের পর ক্ষনিকের জন্য হঠাৎ আলোর বিচ্ছুরণ। মুহূর্তে আকাশ আলোয় ভরে উঠল। ক্যারন সময় নষ্ট করেননি। ক্যামেরা

বের করে পট পট করে ছবি তুলতে সুরু করেছিলেন। তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া ছিল ছবি তোলার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন—স্থির জলে ভারি পাথর ফেললে যেমন এক আবর্তনের সৃষ্টি হয় জলে—তেমনি এক আবর্তন নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে। ক্যারন জানিয়ে দিলেন কর্ণেল টিবেটকে ঘটনাটি। কর্ণেল টিবেট তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্রমাগত কথা বলে যেতে এবং এইভাবে কথা বলতে বলতে তার স্নায়ুর চাপ কমে যাবে। কর্ণেল টিবেট বুঝতে পেরেছিলেন প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপে কাহিল হয়ে আসে সার্জেন্ট ক্যারন।

কিছুক্ষণ পরে বাতাসের সেই আবর্তন 'এনোলা গে'র গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। মুহূর্ত্তে প্রায় বেসামাল হয়ে গিয়েছিল বিমানটি। আবর্তন এত তীব্র ছিল যে 'এনোলা গে'র আরোহীদের কেউ কেউ মনে করেছেন 'এনোলা গে'র গায়ে আঘাত হেনেছে কোন কিছু।

কর্ণেল টিবেটের তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা। বিদুরের মুখে কাহিনী শুনতে হত ধৃতরাষ্ট্রকে। কর্ণেল টিবেট চালকের আসনে বসে পিছনের দিকের কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে তাকে নির্ভর করতে হচ্ছিল সার্জেন্ট ক্যারনের চোখে দেখা বিবরণীর ওপর। কর্ণেল টিবেট বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন ক্যারনকে—বলুন এখন কি দেখছেন, কি দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু আমাকে সবিস্তারে বলুন। চোখ সামনের দিকে, কানে ইয়ার ফোনে ভেসে আসছে ক্যারনের ভাষ্য। বুঝতে পারছিলেন কর্ণেল টিবেট যে বিশেষ বোমাটি ফেলার দায়িত্ব তাদের ওপর দেওয়া হয়েছিল সেটি সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষেপিত হয়েছে। কর্ণেল টিবেট শুধু জানতেন না এই কথাটি যে, শক্তিশালী জোরালো কোন বোমা-পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম বোমা 'এনোলা গে' থেকেই নিক্ষেপিত হল।

আগুনে মেঘের থেকে অনেক দূরে সরে এসে কর্ণেল টিবেট আবার একটা বাঁক নিলেন। আর ঠিক তখনি সার্জেন্ট ক্যারনের চোখের

সামনে ভেসে উঠল নিচে হিরোসিমা শহরের দৃশ্যটা। বিমানের বাকি আরোহীরাও এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সব কিছু। ইন্টারকমে সহযাত্রীরা নিচের দেখা দৃশ্যটি জানাচ্ছিলেন অন্য সহযাত্রীদের ইন্টার-কমের সাহায্যে। সবারই বক্তব্য ছিল এক—নিচে সহরের ওপর একটা ঘন বেগুনে আস্তরণ যেন কে বিছিয়ে দিয়েছে। সেই আস্তরণের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে ঘর-বাড়ী, মানুষ-জন।

এবার ঘরে ফেরার পালা। কর্ণেল টিবেট নির্দেশ দিলেন সার্জেণ্ট ক্যারনকে—একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে থাক। ভাসমান মেঘটি দৃষ্টির আড়ালে গেলেই আমাকে জানাবে।

ফেরার পথে বিমানের সহ যাত্রীরা কেউ আর কোন কথা বলেননি। ভয়াবহ এক ধ্বংসের সাধন ঘটিয়ে নিরাপদে তারা ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এবারের আক্রমণের সাফল্য তাদের ততটা উল্লসিত করে তুলতে পারে নি। কেননা সবটা না জানলেও একথা তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে একটি বোমার আঘাতে এমন ভয়ানক এক মারণ-কাণ্ডের এই অভিযানে নিহত ও আহতের সংখ্যা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বনাশা ধ্বংসের মধ্যে একটি হয়ে উঠতে পারে।

হিরোসিমা থেকে তিনশো তেষট্টি মাইল দূরে এসে সার্জেণ্ট ক্যারন জানিয়েছিলেন কর্ণেল টিবেটকে—এতক্ষণ যে ভাসমান মেঘ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা এই মাত্র আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

অর্থাৎ আকাশপথে হিরোসিমা শহর থেকে তিনশো তেষট্টি মাইল দূর অবধি দেখা গিয়েছিল—হিরোসিমা সহরের ওপর ভেসে থাকা নিক্ষেপিত এ্যাটম বোমার অগ্নিগোলক।
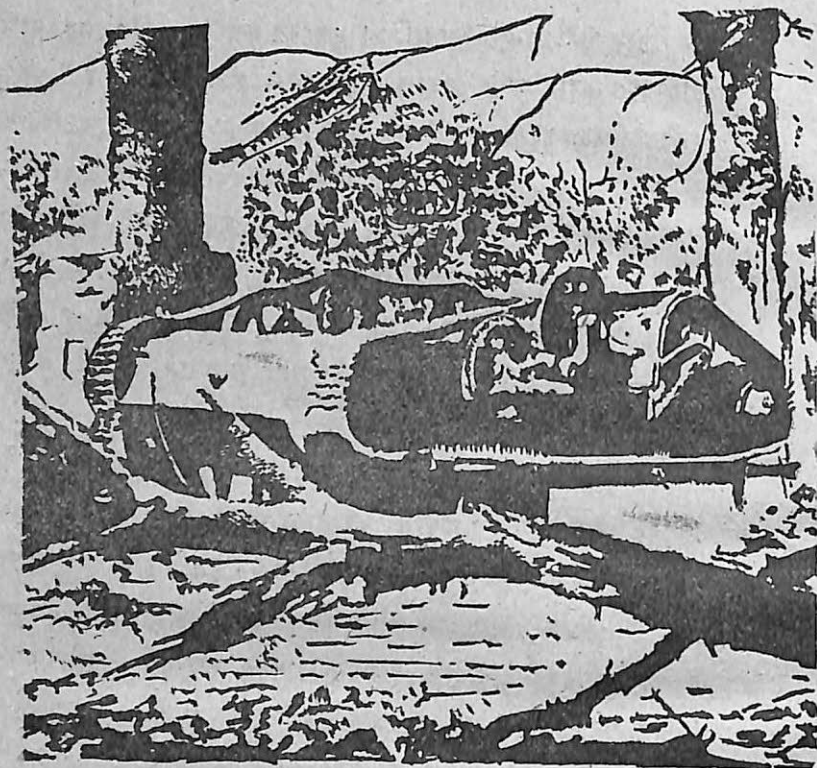
হিটলার যেদিন মরল না

বার্লিনে স্টফেনবার্গ তাঁর বাড়ীর ফায়ার প্লেসের পাশে বসে শেষবারের মত একটি পরিকল্পনার খসড়া দেখছিলেন। আগুনের লাল আভা তার মুখে নাচছিল। পাশে টেবিলের উপর পানীয়। রক্তাভ। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা। স্টফেনবার্গ এক মগ্ন স্তব্ধতায়, পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখে রাখছিলেন।

এক চরমতম পরিকল্পনা দেখছিলেন বলেই এই মগ্নতা। চতুর্দিকের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে সাফল্য। হিটলারের মৃত্যুর মধ্যে ঘটবে এই স্বপ্নের উত্তরণ। যদি তা না হয়, তবে ভবিতব্য নির্ধারিত। জার্মানীর আরও কয়েকটি উষ্ণ প্রাণ হবে শীতল, আরও একটি হিটলার নিধন পরিকল্পনা হবে ব্যর্থ।

পরিকল্পনার নাম ভেবে চিন্তে দেওয়া হল, "ভলকাইরাই"। কিন্তু ভলকাইরাই কেন? স্টফেনবার্গই ব্যাখ্যা জানালেন, "ভলকাইরাই" কোন ধার করা শব্দ নয়। বিশুদ্ধ ও প্রচলিত জার্মান শব্দ। এর উল্লেখ জার্মান-পুরাণে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে— ভলকাইরাই হল এক ধরনের কুমারী, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে উড়ে বেড়ায় ও খুঁজে বেড়ায় তাদের মৃত্যুর ফাঁস ঝুলিয়ে দিতে হবে কাদের গলায়, যেহেতু স্টফেনবার্গরাও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। একজনকে ও মৃত্যুর ফাঁস পরাতে চাইছিলেন সেই বিশেষ জনেরই গলায়, তাই নিজেদের 'ভলকাইরাই' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

একটার পর একটা সমস্যা সামনে জাগছিল। প্রথমেই মনে জেগেছিল 'বার্লিন কিভাবে দখল করা যাবে'। কিংবা বার্লিন দখলে বাধা কোন্ কোন্ জায়গা থেকে আসতে পারে?"

'বার্লিন দ্রুত দখলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনেরা। সংখ্যায়ও তারা অনেক বেশী। দ্রুত তাদের অকেজো না করে ফেলতে পারলে সমূহ বিপদ। অবশ্য ভরসার কথা একটা ছিল! এই চক্রান্তে পুলিশেরও বেশ সায় ছিল। জানা ছিল, পুলিশ মদত দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিক্রেট সার্ভিসের সমান হওয়া যাবে না। ফারাক যেটুকু থাকবে গতি দিয়ে সেটুকু পূরণ করে নিতে হবে। দ্রুত বেগে কাজ সারতে পারলে প্রতিপক্ষ প্রস্তুতির আগেই হবে পরাভূত।

স্টফেনবার্গ চোখ তুলে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকালেন। লাল টকটকে গনগনে আগুন। ধোঁয়া নেই, উষ্ণতা আছে। সেই লাল উষ্ণতার দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তিনি ভাবতে চাইলেন তাদের চক্রান্ত সফল হলে কি ভাবে নেবে জার্মানীর জনগণ। মুহূর্তে ভাবনা টুটে গেল। একটা বোধ তার মনে পরিব্যাপ্ত হল। আর তা হল—শনি ঘাড় থেকে নামলে খুশী না হয় কে? হিটলার জার্মানী থেকে বিতাড়িত হলে আনন্দ পাবে না কোন জন?

স্টফেনবার্গ আবার খসড়াটির দিকে চোখ ফেরালেন। পরিষ্কার

সারি সারি হরফ। কি পদ্ধতিতে বার্লিন দখল করতে হবে—সেই নির্দেশের দিকে তিনি চোখ রাখলেন। লেখা ছিল—দ্রুততার সঙ্গে বার্লিন দখল করতে হবে। মাত্র প্রথম দুটি ঘণ্টার মধ্যেই বোঝা যাবে ঘটনার পরিণতি কোন দিকে। অর্থাৎ প্রথম দুটি ঘণ্টায় আঘাতের বেগ দুর্বার না হলে ব্যর্থতা ও হতাশায় ঘটবে এই উদ্যোগের শেষ পরিণতি।

আঘাতের প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রথম কাজ হবে, ন্যাশানাল ব্রডকাষ্টিং হেডকোয়ার্টার্স ও দুটি রেডিও ষ্টেশন দখল করে নেওয়া। ষ্টফেনবার্গ বিশ্বাস করতেন, যদি রেডিও মারফত প্রচার করা যায়—হিটলার আর ক্ষমতায় নেই, বার্লিন এখন আমাদের দখলে—তাহলে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ—যারা এখনও মুখ বুজে রয়েছে তারা তাঁদের সঙ্গে যোগদান করবেন। তাছাড়া প্রচারের অন্য এক বিশেষ মূল্যও আছে।

গোয়েবলস্ প্রচারের মাধ্যমে হিটলারের কীর্তি ও মহানুভবতার কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রেডিও বার্লিন ক্রমাগত শোনাতেন হিটলার কি রকম অসম্ভব সব কাজ করতে পারেন। প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গীয়ে অনুকূলতাকে কিভাবে ছিনিয়ে আনতে পারেন। তাঁর প্রচারে মনে হত, হিটলার এক অলৌকিক আবির্ভাব, অসম্ভবকে সম্ভব করা যার নিয়মিত অভ্যাস।

এহেন গোয়েবলসের ওপর ষ্টফেনবার্গ ও তাঁর সহযোগী চক্রান্ত-কারীদের তীব্র বিদ্বেষ ছিল। গোয়েবলসের নামের নীচে প্রথমেই তাই দাগ পড়েছিল। বার্লিনের দখলের সঙ্গেই গোয়েবলস গ্রেফতারও তাই পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত হয়েছিল। গোয়েবলস্-এর সহযাত্রী সিক্রেট সার্ভিসের লোকেদেরও উল্লেখ রাখা হয়েছিল।

ষ্টফেনবার্গ-এর চোখ এসে থামল যেখানে লেখা ছিল—হিটলার যখন নিহত হবেন। বারকয়েক তিনি একই কথা পড়লেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আত্মমগ্নভাবে বললেন,—যখন তিনি নিহত হবেন……। উচ্চারিত শব্দে চকিতে তিনি খসড়াটি তুলে নিলেন। তার মনে ছিল না কখন কোলের ওপর নামিয়ে রেখেছিলেন।

'হিটলার যখন নিহত হবেন ঠিক তখনই রাস্টেনবার্গকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কারণ শুধু হিটলারের নয়, হিটলারের সাঙ্গ-পাঙ্গদের মধ্যে ক্ষমতাবান যারা, যেমন—হিমলার, গোয়েরিং কিংবা জোড্‌ল বা কাইটেল কেউই পাল্টা প্রতিরোধ যাতে খাড়া না করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সুদূর-প্রসারী এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তুটি ঘণ্টার করণীয় বিষয়গুলি পড়া শেষ করলেন স্টফেনবার্গ।

রোমেল দূরে আফ্রিকায়, অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন জার্মানীর নানা প্রান্তে। সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে খবরটা, যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। সময় বেশী নেই, গোপনীয়তার আড়ালে এবার সময় এসেছে খবর পৌঁছে দেবার।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, হ্যাঁ, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই, নতুন সরকার ঘোষণা করতে হবে। তা নইলে কিছু জেনারেল পিছলে বেরিয়ে গিয়ে অতর্কিত আঘাত হানতে পারে। ভাববার অবকাশ পেতে পারে। ভাববার বিন্দুমাত্র অবকাশও দেওয়া চলবে না। পিছলে যাবার সব পথ বন্ধ রাখতে হবে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনায় সারা পৃথিবী জুড়ে তোলপাড় হবে প্রতিটি দেশের সংবাদ পত্রের অফিসের টেলিফোন বাজবে মুহুর্মুহু। জার্মানী জুড়ে নামবে আনন্দ উল্লাস।

হিটলার মারা গেছেন—সবচেয়ে আগে এটা জানা দরকার। যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে হিটলার আর নেই, তখন তার অনুগত অফিসারদের ওপর যে প্রবল স্নায়ুর চাপ পড়বে সেটা কাজে লাগাতে হবে—ভাবলেন স্টফেনবার্গ।

গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটির দায়িত্ব স্টফেনবার্গ নিজে নিলেন। হিটলার নিধনের বন্দোবস্ত তিনিই করবেন। স্বচক্ষে দেখবেন হিটলার নিহত, তারপর খবর দেবেন সবাইকে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যাবে অপারেশন "ভলকাইরাই"।

কিন্তু সবচেয়ে আগেতো দরকার হিটলারের সঙ্গে দেখা করার

বন্দোবস্ত করার। তার ব্যবস্থাও করেছিলেন স্টফেনবার্গ।

হিটলারের দপ্তরে খবর পাঠালেন স্টফেনবার্গ—'একটি জরুরী রিপোর্ট ফুয়েরারকে দিতে হবে তাই তিনি ফ্যুয়েরারের সঙ্গে বিশে জুলাই দেখা করবেন, উত্তর এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে, স্টফেনবার্গ আসতে পারেন। হিটলার দেখা করবেন।

সহসা একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছালো। অতর্কিত আঘাতে ভারাক্রান্ত হল হিটলার বিরোধী শিবির। খবর এল—ফিল্ড মার্শাল গুরুতর আহত, বোমারু বিমানে আঘাতে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। তিনি এখন জীবন মরণের সীমানায়।

খবর পৌঁছেছিল স্টফেনবার্গের কাছে। আঠারোই জুলাই উনিশশো চুয়াল্লিশ, তিনি খবর পেয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করেছিলেন তিনি। ঘরে তাকিয়েছিলেন টেবিলে রাখা ক্যালেণ্ডারের দিকে। তার নজর পড়েছিল বিশে জুলাই দিনটিকে ঘিরে চৌকো দাগ ছিল, সেই দিকে। বিশে জুলাই এক কঠিন শপথের দিন। রোমেলের এই আকস্মিক ঘটনা তাঁকে চিন্তিত করে তুললেও সংকল্প থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন না। মনে মনে রোমেলের আরোগ্য কামনা করলেন। তারপর যেমন ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার তেমনিভাবে বিশে জুলাইয়ের জন্য নিজেকে তিনি প্রস্তুত করে তুললেন।

হিটলার, স্টফেনবার্গের প্রমোশনের অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রমোশনের সুবাদে হোম আর্মির চিফ হয়েছিলেন তিনি। যেহেতু চিফ, সেহেতু ফ্যুয়েরার হিটলারের সঙ্গে আলোচনা কিংবা কথোপকথন দু'য়েরই দরকার ছিল। প্রয়োজনে দেখা হত দু'জনার।

স্টফেনবার্গ ঠিক করেছিলেন এমনই কোন এক আলোচনা সভায় তিনি স্যুটকেসে করে বোমা নিয়ে যাবেন। টাইম বোমা। কোন ছল ছুতায় বেরিয়ে আসবেন। বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফাটবে। আর সেই শব্দ থেকেই বোঝা যাবে, হিটলার আর নেই। দ্রুত পেঁ ৗছে দিতে হবে

খবরটা সবাইকে। তারপর নতুন সরকার গড়ার পালা। যুদ্ধহীন পৃথিবীতে আপোস আলোচনার পালা।

সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিজে থেকেই তুলে নিয়েছিলেন স্টফেনবার্গ। শুধু হিটলার নিধনই নয়—বার্লিন দখল করার নেতৃত্বও তিনি দেবেন স্থির করলেন। একই দিনেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজের দায়িত্ব তিনি নিলেন সানন্দে।

বিশে জুলাই, ভোর পাঁচটায় স্টফেনবার্গ ঘুম থেকে উঠলেন। হালকা মনে শিস দিতে দিতে জামা পরলেন, মুখ ধুলেন, দাড়ি কামালেন! বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এসে যাওয়াতে তাঁকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল।

গ্রীষ্মকালের সকাল। প্রায় ছ'টা নাগাদ এসে পৌঁছলেন লেফ্‌টেনেন্ট ওয়ার্নার। বাইরে সকালের নরম আলো। অল্প অল্প বাতাস বইছে। তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে বসে প্রাতঃরাশ সারলেন। ছ'টা বাজার কিছু পরে সোফার এসে জানালো, গাড়ী তৈরী। তাঁরা রাস্টেনবার্গ যাবার জন্য রংগ্‌সডর্ফ বিমান বন্দরের দিকে রওনা হলেন। যাবার আগে, খুব সন্তর্পণে অসীম মমতায় ছোট একটি স্যুটকেস স্টফেনবার্গ নিজের হাতে তুলে নিলেন।

স্যুটকেসে ছিল কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কয়েকটি জামা ও ছোট একটি মোড়ক। মোড়কটিতে ছিল শক্তিশালী একটি টাইম বোমা! বিশে জুলাইয়ের সাফল্যের সব কিছু নির্ভর করেছিল ঐ ছোট্ট টাইম-বোমার সময় মতো ফাটার ওপর।

বিমানবন্দরে স্টফেনবার্গের গাড়ী পৌঁছতেই এগিয়ে এলেন জেনারেল ষ্টিয়েফ। করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। জেনারেল ষ্টিয়েফই আগেরদিন গভীর রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন টাইম বোমা।

স্টফেনবার্গ প্রথম কথা বললেন, "আজকে দিনটা খুব উজ্জ্বল।"

মৃদু হাসলেন জেনারেল ষ্টিয়েফ। বললেন—"উজ্জ্বলতর হোক আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, গুড লাক।"

—"অপেক্ষা করুন সুখবরের, সুদিনের!"—কথা শেষ করে ষ্টফেনবার্গ অপেক্ষমান বিমানের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই বিমানের প্রপেলার গর্জে উঠলো। প্লেন ছুটে চললো। ঐতিহাসিক বিশে জুলাই-এর পরিকল্পনা এগিয়ে চললো।

রাস্টেনবার্গের পথে পূর্ব প্রুশিয়াতে যখন পৌঁছলেন তখন সেখানকার আবহাওয়া খুব ভারী, আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা, কালোমেঘের ঘন ছায়া মাটিতে। ষ্টফেনবার্গ দেখছিলেন একবার, যতদূর চোখ যায়।

হিটলারের সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি একবার টেলিফোন বোর্ডের ইনচার্জ সার্জেন্ট মেজরের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, "বার্লিন থেকে একটা ফোন আসবে। অত্যন্ত জরুরী। যখনই আসুক, আমাকে একবার ডাকবেন। মনে রাখবেন, ফোনটা খুব জরুরী।"

সার্জেন্ট মেজর স্যালুট করে ঘাড় নাড়লেন। ষ্টফেনবার্গ স্যুটকেস হাতে আলোচনা কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাড়ী থেকেই টাইমবোমার ফিউজ ঠিক করে এনেছিলেন। সুরু করার দশ মিনিটের মধ্যে বোমা ফাটবে। ঘরে ঢুকে দেখলেন, দুয়ারের দিকে পিছন ফিরে হিটলার বসে আছেন! তার সামনে একটি বড় টেবিল, টেবিলের চার পাশে বসে আছেন জোডল, এয়ার ফোর্সের কর্ণেল হেইঞ্জ ব্রানডট, জেনারেল হুসিঙ্গার, কাইটেল।

নিজের আসনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, হিটলার হাতে একটা কি যেন নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আর একটু এগুতেই বুঝতে পারলেন, ওটা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। টেবিলের ওপর রাখা ছোট মানচিত্রটি দেখবার সময় হিটলার ওটি ব্যবহার করতেন। মনে মনে বললেন ষ্টফেনবার্গ, "ফ্যুয়ার ও আপনার পার্ষদেরা! আর

মাত্র দশ মিনিট। আপনাদের যা দেখবার ও বলবার আছে বলে নিন। আর মাত্র দশ মিনিট পর হবে প্রচণ্ড একটি শব্দ এবং তারপর থেকেই আপনাদের অস্তিত্ব হবে নিরুদ্দেশ।

কাইটেল জানালেন হিটলারকে, —"ভন স্টফেনবার্গ এসে পৌঁছেছেন।"

হিটলার ঘুরে আড়চোখে দেখলেন। একচোখ কানা ও একহাত কাটা স্টফেনবার্গের অবশিষ্ট হাতটিতে স্যুটকেস দৃঢ়ভাবে ধরা। মৃদু হেসে হিটলার বললেন,—"একটু অপেক্ষা করুন। হুসিঙ্গারের রিপোর্ট শেষ হলেই আপনার রিপোর্ট শুনবো।"

স্টফেনবার্গ তার আসনে বসলেন। সবার অজ্ঞাতে টেবিলের নীচে স্যুটকেসটি খুলে টাইমবোমা চালু করলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। চার মিনিট সময় কেটে গেল। আর মাত্র ছয় মিনিট। ঘরে সবাই গভীরভাবে হুসিঙ্গার-এর কথা শুনছেন। স্টফেনবার্গ সবার দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন। তারপর নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেলেন, স্যুটকেসটি রইল টেবিলের নীচে। ঘরে যারা সেনট্রি ছিল তারা ভাবল, স্টফেনবার্গ বাথরুম কিংবা অন্যত্র যাচ্ছেন।

অষ্টআশী নম্বর বাঙ্কারের জেনারেল ফেলজাইবেল-এর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছিলেন স্টফেনবার্গ, 'আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর শুধু শেষ নয়, সাফল্যের সঙ্গে শেষ।'

হুসিঙ্গার তাঁর রিপোর্ট পড়ছিলেন। কর্ণেল ব্রাণ্ডট শুনতে শুনতে ঝুঁকে পড়লেন। তার পায়ে কি যেন ঠেকল। নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি দেখলেন একটা স্যুটকেস' স্টফেনবার্গের। তিনি টেবিলের ওপর সেটি তুলে রাখলেন। তাঁর ও হিটলারের মধ্যে রইল স্যুটকেসটি। তিনি জানতেও পারলেন না তারই মধ্যে টিক টিক করে বেজে চলেছে মরণঘণ্টা, রয়ে গেছে ছোট্ট একটি টাইম বোমা।

হুসিঙ্গার এর রিপোর্ট পড়া শেষ হল না। ঠিক বেলা বারটা

বেজে বেয়াল্লিশ মিনিটে তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে ভয়ঙ্কর শব্দে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল সেই ঘরে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়লো। জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ছিন্নভিন্ন বহু দেহ।

অষ্টআশী নম্বর বাঙ্কারের এক চোখ ও এক হাতওয়ালা মানুষটির চোখে ফুটে উঠল খুশীর ঝলক। তাঁর মনে হল, প্রথম রাউণ্ডে তিনি সফল। স-পার্ষদ হিটলার এখন মৃতদেহের স্তূপে জড়াজড়ি করে রয়েছে। এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল রাস্টেনবার্গ হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে পড়ে বার্লিন দখলের কাজ শেষ করা। কিন্তু রাস্টেনবার্গ থেকে বেরুনো সহজ হবে কি? স্টফেনবার্গ বুঝতে পারছিলেন, বোমার আওয়াজ পাওয়া মাত্র চতুর্দিকে পাহারা আরও জোরদার করা হবে। বাইরের লোকের আসা যেমন বন্ধ থাকবে, তেমনি ভেতরের লোকেরও বাইরে যাওয়া বন্ধ করা হবে।

কি হতে পারে কিংবা কি হবে এত ভাববার মত সময় স্টফেনবার্গের ছিল না। খুশীতে উদ্দীপ্ত মুখে স্টফেনবার্গ গাড়ীতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে বললেন, "এয়ারপোর্টের দিকে চল, তাড়াতাড়ি।"

বাধা পড়ল প্রথম চেকপোষ্টে! একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টফেনবার্গকে বললেন, "আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। সম্ভবত জানেন, একটু আগে বাঙ্কারে একটা বোমা ফেটেছে।"

গাড়ীর মধ্যে ভ্রু কোঁচকালেন স্টফেনবার্গ। বললেন, "আমি হোম আর্মির চীফ, স্টফেনবার্গ। বোমার শব্দ আমি শুনেছি। আমার এখনই বার্লিন যাওয়া প্রয়োজন।"

—"কিন্তু আমার পক্ষে আপনাকে এখান থেকে বেরুতে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।" একটু থামলেন সার্জেন্ট, এক হাত ও এক চোখ-ওয়ালা লোকটিকে দেখে হয়তো একটু করুণা হল। বললেন—"আমার ওপরওয়ালার সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমি আপত্তি করবো না।

স্টফেনবার্গ বিন্দুমাত্র দেরী না করে দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে

এলেন। সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন বুথ থেকে ফোন করব"

সার্জেন্ট ইঙ্গিতে সামনের দিকে দেখালেন, স্টফেনবার্গ এগিয়ে রিসিভারে হাত রাখলেন।

সার্জেন্ট দেখলেন, স্টফেনবার্গ কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কিছুক্ষণ কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। সার্জেন্টকে বললেন, আমার পথ ছেড়ে দিন, যাবার প্রয়োজনীয় অনুমতি আমি পেয়েছি।"

সার্জেন্ট আর কোন কথা না বলে পথ ছেড়ে দিলেন। স্টফেনবার্গের গাড়ী এগিয়ে চললো। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ফোনে কার সঙ্গেই তিনি কথা বলেননি। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। সার্জেন্ট তাঁর ছল বুঝতে পারেননি। আর মাত্র তিনটি প্রতিরোধ তাকে পার হতে হবে, তাহলেই রাষ্টেনবার্গ ছেড়ে বেরুতে পারবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেকপোষ্টেও স্টফেনবার্গ গম্ভীরভাবে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করলেন। কিন্তু সব শেষের চেকপোষ্টে এসে গোল বাধল। এখানে বাধা নিষেধ সবচেয়ে বেশী। গোমড়ামুখো সার্জেন্ট কোলবি নারাজ হলেন তাকে যেতে দিতে। স্টফেনবার্গও নাছোড়বান্দা। বললেন, "আমাকে যেতে হবেই। বলুন এ ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সার্জেন্ট কোলবি বললেন—এখানে কথা বলার কেউ নেই। আপনি যদি আদৌ কথা বলতে চান তবে ঐ যে ফোন আছে, ফোনে ক্যাপ্টেন মোলেনডর্ফ এর সঙ্গে কথা বলুন। উনি অনুমতি দিলে আমি না বলব না।"

দ্রুত ভেবে নিলেন স্টফেনবার্গ কি বলবেন ক্যাপ্টেন মোলেনডর্ফকে। একটু পরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল মোলেনডর্ফ এর কণ্ঠস্বর।

'বাঙ্কারে বোমা ফেটেছে বলে আমাকেও ওরা বেরুতে দিচ্ছে না।" বললেন স্টফেনবার্গ।

"হ্যাঁ কাউকেই বেরুতে না দেবার নির্দেশ আছে।"

"কিন্তু আমাকে যে এখন যেতেই হবে, এয়ারপোর্টে আমার জন্য জেনারেল ফ্রোম অপেক্ষা করে আছেন। বিশেষ জরুরী, আমাকে যেতেই হবে।"

"কি ব্যাপার?"

"বললাম তো, খুব জরুরী এবং গোপনীয়।"

মোলেনডর্ফ বিন্দুমাত্র সন্দেহও না করে বললেন, "যদি তাই হয়, তবে আপনি রওনা হন।"

স্টফেনবার্গ ফোন রেখে সার্জেন্ট কোলবিকে বললেন, "আমার যাবার অনুমতি মিলেছে। পথ ছাড়ুন।"

শীতল চোখে তাঁর দিকে তাকালেন সার্জেন্ট কোলবি। শীতলতর স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তাই নাকি?" বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমি নিজের কানে আগে নির্দেশটা শুনে নিই।

"বেশ তো।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন স্টফেনবার্গ।

একটু পরেই ফিরে এলেন সার্জেন্ট কোলবি। বললেন, "আপনি যেতে পারেন।"

স্টফেনবার্গের গাড়ী নিমেষেই এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চললো।

এবারও স্টফেনবার্গ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এয়ারপোর্টে তাঁর জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল না। জেনারেল ফ্রোম যে তখন বার্লিনে, তাও তিনি জানতেন। তবু মিথ্যা কথা ছাড়া যে বেরুনো যাবে না তা বুঝতে পেরে এই চাতুরিটুকু তিনি করেছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টফেনবার্গ এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন। দ্রুত প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। একটু পরেই প্লেন আকাশে উড়ল। ঘড়িতে তখন বেলা একটা।

প্লেনে উঠে তাঁর আক্ষেপ হল, ভাল রেডিও নেই বলে! রঙ্গসডর্ফ পৌঁছতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে। তার আগেই বার্লিনের

সব কিছু ঘটে যেতে হবে। এই তিন ঘণ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাজ তিনি করেছেন। হিটলারের ঘরে টাইমবোমা ফাটিয়েছেন। এখন তাঁর সহযোগীদের কাজ করার পালা।

প্লেনের জানালা দিয়ে তিনি বাইরে তাকিয়েছিলেন। ভাবছিলেন, 'এতক্ষণে নিশ্চয় খবরটা বার্লিনে পৌঁছে গেছে। রেডিও মারফৎ নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা যে হিটলার আর নেই। একের পর এক অফিসও দখল করার কাজ নিশ্চয় এগিয়ে চলেছে। তাঁর মনে পড়ল রোমেলের কথা। ভাবলেন—আজ রোমেল জানতেও পারছেন না, কি বিরাট ব্যাপার ঘটে চলেছে। জার্মানীতে কি পরিবর্তন আসছে!'

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় অস্থির ভাবে কাটালেন স্টফেনবার্গ। শুধু কল্পনা করলেন কি ঘটছে, কিংবা কি ঘটতে পারে। উন্মুখ প্রতীক্ষায় রইলেন রেডিয়ো শোনার জন্য। বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছিল সময়টুকু।

বিকেলের রোদে যখন গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ছিল, এয়ার-পোর্টে ছড়িয়ে ছিল ম্লান আলো, তখন একটি প্লেন আকাশের বুক চিরে নেমে এল রানওয়ের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উজ্জ্বল মুখে যিনি নেমে এলেন তিনি স্টফেনবার্গ। বেলা তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তাঁর প্লেন রঙ্গসডর্ফ পৌঁছলো।

জানা ছিল, টেলিফোন কোথায় আছে। স্টফেনবার্গ সেদিকেই ছুটে গেলেন। ফোন করলেন জেনারেল অলব্রিখটকে।

"হ্যালো অলব্রিখট। সব কাজ ঠিকমত এগিয়েছে, বার্লিন দখল হয়ে গেছে?"

ওপাশ থেকে অলব্রিখট-এর উত্তেজিত স্বর ভেসে এল, "আপনি এসে গেছেন! আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা।"

"সেকি? গুরুত্বপূর্ণ দু'ঘণ্টায় কিছু না করে আপনারা চুপচাপ আমার জন্য বসে আছেন?"

"কি করবো? টেলিফোনে বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছিল। আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি হিটলার মারা গেছেন কিনা। আমরা এখানে

সবাই প্রস্তুত। বেনডেলস্ট্রেসে সবাই উদ্বিগ্ন ভাবে আপনার ফেরার অপেক্ষায় আছে। আপনার কাছ থেকে খবর পেলেই কাজ সুরু হবে।”

দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন স্টফেনবার্গ। “সময় নেই। তাড়াতাড়ি করুন। আমি নিজের কানে টাইমবোমার শব্দ শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি সেই ঘর থেকে মৃতদেহ ছিটকে বেরিয়ে আসছে। হিটলার আর নেই। থাকতে পারেন না। “ভলকাইরাই” এর পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করুন। মনে রাখবেন সময় চলে গেলে সুযোগও চলে যাবে। তাড়াতাড়ি করুন।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেলজাইবেল নির্দেশজারী করলেন, হেড-কোয়াটার্সের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কর। এখন কোন যোগাযোগ না রেখে, আমাদের পরিকল্পনা মতো এগুতে হবে।

হেডকোয়াটার্স, বার্লিনের কোন খবর না পেয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। বহু চেষ্টার পর যোগাযোগ করা সম্ভব হল। কিন্তু যে খবর এসে পৌঁছাল তা অভাবিত। খবর পাওয়া গেল, বার্লিনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে।

স্টফেনবার্গ তিতি বিরক্ত হচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, বেলা তিনটা প ঁয়তাল্লিশের পরই শুরু হল আসল কাজ। গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘণ্টা নিঃসাড়ে বয়ে গেছে। ভাবতে চেষ্টা করলেন, এখনও কি ঘটতে পারে? কি ঘটা সম্ভব।

অবাক হয়ে ভাবছিলেন তিনি, টাইম মোমা, ফেটেছে শুনেও অলব্রিখট কেন কোন কাজ এগুনোর কথা ভাবেন নি! এমন দেরীর কি মানে হয়!

আসলে অলব্রিখটের কোন দোষ ছিল না। ট্রাঙ্ককলে সে খবর পেয়েছিল, টাইম বোমা ফেটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পৌঁছেছিল —হিটলারের কোন ক্ষতি হয়নি। তাই, যেহেতু হিটলার জীবিত, ‘ভলকাইরাই’ এর পরিকল্পনাও স্থগিত রাখার কথা তিনি ভেবেছিলেন।

স্টফেনবার্গের উপস্থিতি সমস্ত ঘটনাকেই পরিবর্তিত করে দিল। তাঁর মুখে হিটলারের মৃত্যুর খবর শুনে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন অলব্রিখট। কর্ণেল মের্টজ, অলব্রিখটের চিফ অব স্টাফ অফ টেলিপ্রিন্টারের পাশে বসলেন। টেলিপ্রিন্টারে শব্দের ঢেউ উঠল, 'ভলকাইরাই' এর নির্দেশ সবার কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

টেলিপ্রিন্টারে খবর ছড়িয়ে পড়ল—হিটলার নিহত।

ইতিমধ্যে অলব্রিখট একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। কাজ এগিয়ে নেবার বদলে তিনি টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসলেন, সরাসরি ফোন করলেন কাইটেলকে। তিনি জানতেন, রাস্টেনবার্গের সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তবু একবার দেখবার জন্যে ফোন করেছিলেন। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন ফোন বাজছে। একটু পরেই ওপাশ থেকে কাইটেলের গলার আওয়াজও পাওয়া গেল।

অলব্রিখট জানতে চাইলেন,— "রাস্টেনবার্গের খবর কি ?"

কাইটেল বললেন,—"হিটলারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ হিটলার ভাল আছেন।"

অলব্রিখট চমকে উঠলেন, তাঁর সমস্ত মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। গম্ভীর নৈরাশ্য তার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল। নিঃশব্দে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে স্টফেনবার্গ এসে পেঁৗছেছেন। উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ছিল। স্টফেনবার্গকে দেখে অলব্রিখট ফিরে এলেন। কোনরকম উপক্রমণিকা না করে স্টফেনবার্গ বললেন— "আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে একটু আগে হেড কোয়ার্টার্সের বাঙ্কারে বোমা ফেটেছে। আমি নিজে মাত্র একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনেছি।"

অলব্রিখট পাশ থেকে ফিসফিস করে বললেন, "একটু আগে আমি কাইটেলের সঙ্গে কথা বলেছি।

—"কার সঙ্গে?" ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন স্টফেনবার্গ।

—"কাইটেলের সঙ্গে। কাইটেল বলছিল হিটলার নাকি মরেননি !"

"যত সব বাজে কথা।" গর্জে উঠলেন স্টফেনবার্গ। "আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—এখন আমি কি কাইটেলের কথা মানবো?"

—"কিন্তু!"

—"কোন কিন্তু নেই।" অলব্রিখটকে স্তব্ধ করে বললেন স্টফেনবার্গ। "হয় হিটলার মারা গেছেন, না হয় তিনি গুরুতরভাবে আহত। তার বাঁচার সম্ভাবনা আর নেই।"

—"আর সময় নেই।" পাশ থেকে জেনারেল বেক বললেন, "হিটলার আহতই হোন আর নিহতই হোন, আমাদের এখন এগিয়ে যেতেই হবে, আর পিছু হটার পথ নেই।"

স্টফেনবার্গ ঘাড় নাড়লেন। ঠিক কথা।

স্ট্র্যাটেজি দ্রুত ঠিক করে নেওয়া হল, পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন করে। ঠিক হল, সবচেয়ে আগে রেডিও ষ্টেশন দখল করে নিতে হবে জেনারেল থিয়েল জানালেন, "তাড়াতাড়ি রেডিও ষ্টেশন দখল করতে না পারলে বিপদ হবে। হেডকোয়ার্টার্স থেকে রেডিও মারফৎ প্রচার করা হবে যে হিটলার জীবিত, এমনকি আহতও হননি বিন্দুমাত্র। সে সুযোগ তাদের দেওয়া যেতে পারে না।

"এছাড়া," স্টফেনবার্গ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এ ছাড়া প্লেন থেকে সহরে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের নতুন শপথ ও নতুন সরকারের কথা।"

পুলিসের বড় কর্তা কাউন্ট হেলডর্ফ দুপুর থেকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। সময় বয়ে চলেছে। কথা ছিল, বেলা একটার পরই খবর আসবে। তিনি তাঁর পুলিসবাহিনী নিয়ে কাজে নেমে পড়বেন। কিন্তু বেলা গড়িয়ে এল। বিকালের রোদ চতুর্দিকে। তবু কোন খবর আসছে না। কি হয়েছে, কি ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে বিশেষ উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন তিনি।

বেলা চারটে বাজার পর আর চুপচাপ বসে থাকতে তিনি পারছিলেন না, তাঁর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল। তিনি সোজা বেণ্ডেলন্টাসের দিকে রওনা হলেন।

অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে বুঝতে পারছিলেন স্টফেনবার্গ, তাঁদের প্রচেষ্টা সমস্যা কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। প্যারিসে ফোন করলেন তিনি। স্তূলনাগেল এর হেড কোয়ার্টাসে সরাসরি।

"হ্যালো।" ওপাশ থেকে স্তূলনাগেল-এর কণ্ঠস্বর।

"আমি স্টফেনবার্গ বলছি। এ্যাকশন, এখন শুধু এ্যাকশন চালিয়ে যান। আমরা এখানে সক্রিয় আছি।"

"আমরাও চুপচাপ বসে নেই। বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই বারশো সিক্রেট সার্ভিসের লোককে জেলে পুরবো—জাল পেতে রেখেছি।" গভীর আত্মপ্রত্যয়ে জানালেন স্তূলনাগেল।

বাকি রইল কে? স্টফেনবার্গ নিজের মনে ভাবলেন। ভেসে উঠল একটি মুখ, ফ্রোম-এর। ফ্রোম-এর সামনে গিয়ে বসলেন তিনি।

"জেনারেল ফ্রোম, এদিককার কাজ এগিয়ে চলেছে, যেমন চলা উচিৎ। আপনার ওদিককার খবর কি? আপনাদের অপারেশনও এবার স্টার্ট করুন।' বললেন স্টফেনবার্গ।

"তার আদৌ কোন প্রয়োজন হবে কি?" বাঁকা স্বরে প্রশ্ন করলেন ফ্রোম।

"কেন?"

"গোটা অভ্যুত্থানইতো এখন ব্যর্থতার পথে।

ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন স্টফেনবার্গ। তাঁর কপালে দেখা যাচ্ছিল ঘামের রেণু। গলার স্বরকে যথাসম্ভব সংযত রেখে বললেন, "কে বলেছে? একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। এখানে সবাই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ্যাকসনে নেমে পড়ছে। ওদিকে হিটলার বোমার আঘাতে গুরুতর আহত।"

"এখানেই ভুল হয়েছে।" বাধা দিয়ে বললেন ফ্রোম। "হিটলারের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। তিনি ভাল আছেন।"

"বাজে কথা।" গর্জে উঠলেন স্টফেনবার্গ।

"মোটেই না, এটাই ঠিক কথা। আমি নির্ধারিত ভাবে জানি হিটলার ভাল আছেন।" গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন ফ্রোম।

"খবরের উৎসটি জানতে পারি কি?" তীব্র শ্লেষে উচ্চারণ করলেন স্টফেনবার্গ।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটু আগে আমার সাথে কাইটেলের কথা হয়েছে। কাইটেলই আমাকে বলেছে।"

"কাইটেল বাজে কথা বলেছে। আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।"

"কিন্তু একটু আগেই যে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।"

"হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে আপনাকে আমি বলছি শুনুন, যখন বোমা ফাটে তখন আমি সেখানে ছিলাম। আমার নিজের চোখে আমি দেখেছি হিটলার আহত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর, তিনি সংজ্ঞাহীন, তাঁকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সম্ভবত এতক্ষণে তাঁর দেহ একেবারে শীতল হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে স্টফেনবার্গ উৎকর্ণ হয়েছিলেন শুনবার জন্য,—ফ্রোম কি বলেন। অল্পক্ষণের জন্য নীরবতা এসেছিল নেমে।

"কাউন্ট স্টফেনবার্গ," শীতল কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ফ্রোম। আমি আবার বলছি আপনাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে।"

"না, হতেই পারে না।"

"আমি বলছি হয়েছে।"

"বাজে কথা, আমি নিজের হাতে বোমা রেখেছি, আমি নিজের চোখে বোমা ফাটতে দেখেছি।"

"যদি তাই হয়। তবে আপনার রিভলবার নিজের কপালে রেখে ট্রিগার টিপুন। কারণ এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কের সেটাই হবে শেষ পরিণাম।"

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অলব্রিখট। স্টফেনবার্গ তাঁর দিকে তাকালেন। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন অলব্রিখট "পুরো

ব্যাপারটা একটু নাটুকে হয়ে যাচ্ছে না কি জেনারেল ফ্রোম ?”

“হ্যাঁ, আপনার মনে হতে পারে। মনে তো কত কি ই হয়। তবে যদি নাটকই বলতে চান তবে শুনুন, এর ক্লাইম্যাক্স এখনও বাকি। আপনাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গেই তা সমাপ্ত হবে।”

“বেইমান, দেখি কে কাকে গ্রেফতার করে।” ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অলব্রিখট।

তারপরেই সুরু হল এক অভাবিত কাণ্ড। সুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। হাতে হাত রেখে চক্রান্ত করার শপথ যারা নিয়েছিল, তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর দিকে। প্রথম আঘাত হানলেন ফ্রোম। উঠে দাঁড়িয়ে ষ্টফেনবার্গের বাঁ কানের ওপরে ধাঁই করে একটা ঘুঁসি কসিয়ে দিলেন। অলব্রিখট একটুও সময় নষ্ট না করে পাল্টা আঘাত হানলেন। গণ্ডগোলের আওয়াজে ছুটে এলেন আরো অনেকে। অলব্রিখট-এর সঙ্গে ফ্রোম-এর তখন হাতাহাতি চলছে।

“বেইমানকে গ্রেফতার কর।” চিৎকার করে বললেন অলব্রিখট।

সবাই এসে চেপে ধরল ফ্রোমকে। তার মুখ এমনিতেই খুব লাল। উত্তেজনায় গনগনে দেখাচ্ছিল তাকে। একটু পরে একটা ঘরে আটক করে রাখা হল ফ্রোমকে।

গোয়েবলস্ এতসব ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর কাছে হিটলার ফোন করেছিলেন, “হের গোয়েবলস্! নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার টেবিলের নীচে টাইমবোমা ফিট করা হয়েছিল। এবং তা সশব্দে ফেটেছে।”

“হায় ভগবান!” অস্ফুটে বলেছিলেন গোয়েবলস্। “আপনার কিছু হয়নিতো ?”

“না, তেমন কিছু নয়। তবে এখুনি কোন প্লেনে করে চলে আসুন। আপনি প্রোপাগাণ্ডা মিনিষ্টার। এই সময় আপনাকে খুব দরকার। আপনি এসে ঘোষণা করুন যে, ফ্যুয়েরার অক্ষত আছে।”

কথা শেষে ফ্যুয়েরার ফোন নামিয়ে রেখেছিলেন।

হিটলারের ছবির নীচে সোফায় বসে গোয়েবলস্ ভাবছিলেন, কে এমন দুঃসাহসী যে হিটলারেব ঘরে বোমা ফিট করে রাখতে পারে। লোকটির নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা ও হঠকারিতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন একান্ত সচিব। বললেন, "লেপ্টেন্যান্ট হ্যাগেন দেখা করতে এসেছেন।

"তাঁকে নিয়ে আসুন।"

একটু পরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন লেপ্টেন্যান্ট হ্যাগেন। তাঁর চোখ মুখে উত্তেজনার আভাস ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি বলে চললেন "হের গোয়েবলস্ বাইরে ভীষণ সব ব্যাপার ঘটছে। একটা হিটলার বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটছে। সত্যি বলতে কি ওরা অনেক জায়গা দখলও করে নিয়েছে।"

"অসম্ভব। কি পাগলের মত বকছেন?" বাধা দিয়ে বলেছিলেন গোয়েবলস্।

"বেশ তো আমার কথা বিশ্বাস যদি না হয় তো জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখুন, ওরা কেমন মার্চ পাষ্ট করছে রাস্তায়।"

গোয়েবলস্ জানালার পাশে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন। একপলক তাকিয়ে পিছিয়ে এলেন। হ্যাগেন এর খুব কাছে সরে এসে বললেন, "আপনি এখুনি একবার মেজর রেমারকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন। তাঁকে বলবেন, খুব জরুরী ও গোপনীয় কাজের জন্য আমার তাঁকে দরকার।

তার একটু পরেই গোয়েবলস্-এর বাড়ীর নীচে রাখা মোটর সাইকেল শব্দ তুলে ষ্টার্ট নিল। হ্যাগেন ছুটে চললেন মেজর রেমার-এর কাছে।

মেজর রেমার-এর কাছে দুটি খবর প্রায় একই সময় এসে পেঁছেছিল। প্রথম খবর বিদ্রোহীদের কাছ থেকে, "এখুনি

গোয়েবলসকে এ্যারেষ্ট করুন।" দ্বিতীয় খবর এল স্বয়ং গোয়েবলস-এর কাছ থেকে, "এখুনি একবার আমার কাছে চলে আসুন দুটি খবরই খুব শান্তভাবে পড়লেন মেজর রেমার।

কুড়িজন লোক নিয়ে রেমার গোয়েবলস এর বাড়ীর দুয়ারে এসে পেঁছিলেন। শেষ বারের মত নির্দেশ দিলেন, "মনে রাখবেন, বার্লিনে সবচেয়ে জঁাদরেল নাজি মন্ত্রী হলেন গোয়েবল। খুব দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করবেন। রিভলবার উঁচিয়ে চলুন। যদি প্রয়োজন হয়, ব্যবহার করবেন।"

গোয়েবলসের ঘরে ঢুকে মেজর হেমারই প্রথম কথা বললেন—"হের গোয়েবলস, আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আপনি বোধহয় শুনেছেন, হিটলার আর নেই। আমরা নতুন সরকার গঠন করেছি।"

"নতুন সরকার?" যেন কতকটা আত্মগত ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন গোয়েবলস।

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মেজর রেমার," একটু থেমে প্রশ্ন করেছিলেন গোয়েবলস, "আপনার পুরানো দিনের কিছু কিছু কথা মনে পড়ে?"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন রেমার।

"আপনার মনে পড়ে' একদিন এই হিটলারের ছবির নীচে কিংবা জার্মানীর পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে আপনি শপথ নিয়েছিলেন আনুগত্যের। আপনার নিশ্চয় একথাও মনে পড়ে, শপথ গ্রহণের সময় আপনি একজন প্রাপ্ত বুদ্ধিমান নাগরিকই ছিলেন।"

মেজর রেমার অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কথা শেষ করার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, "সে সব কথা থাক। তখন হিটলার জীবিত ছিলেন। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।"

গোয়েবলস এক লহমা স্থির দৃষ্টিতে রেমারের-এর দিকে তাকালেন। যেন কিছু শুনতেই পাননি এমন মুখ করে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডায়াল করলেন।

"কাকে ফোন করছেন? আপনি ফোন করবেন না আপনি

এখন আমার কাছে বন্দী।"

নিঃশব্দে হাসলেন গোয়েবলস্। বললেন, "একটু আগে আপনি বললেন না হিটলার মারা গেছেন, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমি হিটলারকেই ফোন করছি। নিজের কানেই তার গলা শুনুন।"

মেজর রেমার অবাক হচ্ছিছেন। তবু তিনি এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। একটু পরেই তিনি শুনতে পেলেন হিটলারের পরিচিত গলা। ত্রস্তে তিনি ফোন এগিয়ে দিলেন গোয়েবল-এর দিকে।

"কি গলা চিন্ততে পারলেন? এবার নিশ্চয় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে যে হিটলার জীবিত।" মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন গোয়েবলস।

মেজর রেমার তখন ভেতরে ভেতরে ঘামছেন। তাঁর সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

গোয়েবলস কোন উপক্রমণিকা না করে হিটলারকে অভ্যুত্থানের কথা জানালেন। ওপাশে গর্জে উঠলেন হিটলার। বললেন, "চুরমার করে ফেলুন সব চক্রান্ত। নির্মম হাতে শেষ প্রতিরোধকেও চূর্ণ করুন।"

"মেজর রেমার এখানে আছেন। তিনিই আমাকে সব খবর দিলেন।" বললেন গোয়েবলস।

"তাঁকে একটু ফোনটা দিনতো, আমি কথা বলবো।"

মেজর ফোন ধরলেন। হিটলার বলে চললেন, "আপনি সময় মতো গোয়েবলসকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। আপনি গোয়েবেলস-এর নির্দেশ মতোই কাজ করুন।"

জেনারেল রেমার পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন।

হিটলার আগের কথার রেশ টেনেই বললেন, 'হিমলারও রওনা হয়েছেন। কিছু পরেই তাঁর বিমান বার্লিনে পৌঁছলে সব কিছুই পাল্টে যাবে। প্রতিরোধ চূরমার করাই হিমলারের অভ্যাস. এতো আপনি জানেনই।"

মেজর রেমার সম্মোহিত মানুষের মতো টেলিফোন রেখে, ধপ করে বসে পড়লেন।

মৃদু হেসে এগিয়ে এলেন গোয়েবলস। রেমার এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "মেজর খুব অবাক হয়ে গেছেন না? আচ্ছা বলুনতো এখন আপনি কোন দলে থাকবেন? ঐ চক্রান্তকারীদের দলে, নাকি আমার দলে।"

কলের পুতুলের মতো উচ্চারণ করলেন মেজর রেমার, "আপনার দলে।"

বিদ্রোহী শিবিরে তখনও কেউ জানে না মেজর রেমার মত ও পথ পরিবর্তন করেছেন। হিটলারকে চূর্ণ করার বদলে হিটলারকে স্তব করার শপথ আবার নিয়েছেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় জার্মান রেডিওর সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। ঘোষকের গম্ভীর স্বর শোনা গেল "আজ দুপুরে হিটলারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর ঘরে টাইমবোমা ফাটে। সৌভাগ্যক্রমে ফ্যুয়েরার-এর গুরুতর কোন আঘাত লাগেনি। তিনি সুস্থই আছেন।"

কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঘোষিত হতে লাগল, "ফ্যুয়েরার আঘাত পাননি, ভাল আছেন।"

স্টফেনবার্গ'ও শুনেছিলেন খবরটা। চারদিকের সঠিক খবর এসে সময় মতো পেঁছিচ্ছিলনা দেখে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। রেডিও ঘোষণার মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠালেন আর্মি হেডকোয়ার্টারসে, "আপনারা প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, যতসব গোয়েবলসী ধাপ্পা। হিটলার আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকতে পারেন না।"

স্টফেনবার্গের কাছে এগিয়ে এলেন একজন মেজর। বললেন, "শুনেছেন, হিমলার আসছেন। গোয়েবলস আমাদের বিরুদ্ধে নামছেন।"

"শুনেছি, কিন্তু চিন্তা কিসের? আমাদের ট্যাঙ্ক আর কিছুক্ষণের

মধ্যেই এসে যাচ্ছে। তারপর আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কে?" দৃঢ়প্রত্যয়ে বললেন স্টফেনবার্গ।

স্টফেনবার্গ ট্যাঙ্কের ঘরঘর ধ্বনির প্রতিক্ষায় যখন উৎকর্ণ, তখন হিমলারের নির্দেশে ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিল বার্লিনের দিকে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো রাত আটটা। আগে নির্দ্ধারিত ছিল, ঠিক রাত আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উইট্‌জলবিন এসে পেঁীছবেন। কথা ছিল, রাত আটটার মধ্যে সব কাজ হাসিল হয়ে যাবে। নব নিযুক্ত সরকারের প্রথম ফিল্ড মার্শাল পদে অভিসিক্ত হবেন উইট্‌জলবিন।

উইট্‌জলবিন এসে দেখলেন স্টফেনবার্গ গম্ভীর মুখে বসে আছে। তাঁর পাশে বেক।

"ব্যাপার কি?" জানতে চাইলেন উইট্‌জলবিন।

"সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবার কাছে খবর গেছে। সবাইকে এ্যাকশনে নামতে বলা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত কোন খবর এখনও আসেনি।" বললেন স্টফেনবার্গ।

"সে কি? সব খবরতো তু'ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হবার কথা ছিল? এতক্ষণে খবর না এলেও বোঝা যাচ্ছে আপনাদের পরিকল্পনার মধ্যে মারাত্মক কোন গলদ ছিল।"

বেণ্ডেলস্ট্রাসের বাড়ী থেকে উইট্‌জলবিন ঠিক আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বেরিয়ে পড়লেন। একটু আগের সমস্ত শপথকে পেছনে ফেলে রেখে তাঁর গাড়ী এগিয়ে চলল গোয়েবলস বাহিনীর হেড কোয়াটার্সের দিকে।

স্টফেনবার্গ বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের বিদ্রোহের পথের দিকে ব্যর্থতা এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছিলেন, দৈবক্রমে এবারও হিটলার বেঁচে গেছেন। সম্ভবত বোমা ফাটার ঠিক আগে তিনি টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। তবু যেহেতু জয় বা পরাজয় কোন খবরই এসে পেঁীছাচ্ছিল না, তাই নিরুৎসাহ বোধ করলেও তাঁরা তাদের সমস্ত আশাকে তখন অবধি নিরুদ্দেশ করতে পারেন নি।

রাত ন'টার সময় নেমে এল শেষ আঘাত। অকস্মাৎ জার্মান রেডিওর ঘোষক জানালেন, "ফ্যুয়েরার হিটলার আগামীকাল সন্ধ্যা পাঁচটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।" সঙ্গে সঙ্গে একথা আবার ঘোষণা করা হল, "ফ্যুয়েরারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। হিটলার ভাল আছেন।"

স্টফেনবার্গের কপালে ভাঁজ পড়ল। বেকও ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। "কিন্তু কি করে তা সম্ভব?" নিজের মনে বললেন তিনি।

বেক কোন কথা বললেন না। রেডিও'র কাছে আরও ঘন হয়ে বসলেন। ঘোষক আবার ঘোষণা করলেন সর্বশেষ পরিস্থিতি। জানালেন, "অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে এসেছে। বার্লিনের অভ্যুত্থানকে চুর্ণ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।"

স্টফেনবার্গ রেডিও বন্ধ করে দিলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা খেলা করতে লাগল। আসন্ন আনন্দের প্রত্যাশা, মগ্ন বিষাদে পরিবর্তিত হল।

রাত প্রায় দশটার সময় বেণ্ডেলস্ট্রাসের বাড়ীতে আবার অনেক-গুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"কে এল? বেক এর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন স্টফেনবার্গ

"দেখা যাক"। উঠে দাঁড়ালেন বেক।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন জন বারো সৈন্য। তাদের হাতে উদ্যত রিভলবার। তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে স্টফেনবার্গ বলে উঠলেন—"সেকি! একটু আগেওতো তুমি আমাদের দলে ছিলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন আপনি আমাদের হাতে বন্দী। কোন ভাঁওতায় আর ভুলছি না।"

স্টফেনবার্গ কথা না বাড়িয়ে হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে একঝাঁক গুলি ছুটে গেল। তাঁর হাতে গুলি লাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। যন্ত্রণায় বসে পড়লেন তিনি।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে জেনারেল ফ্রোমকে মুক্ত করে আনলেন কয়েকজন।

জেনারেল ফ্রোম হাতে রিভলবার নিয়ে এগিয়ে এলেন। মেটজ, হাফটেন ও স্টফেনবার্গের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, "যদি তোমাদের স্ত্রীদের শেষ চিঠি লিখবার সময় চাও তো নিতে পার। মাত্র দু' মিনিটের জন্য এ সুযোগ তোমরা পাবে। তারপর তোমরা হবে অতীতের স্মৃতি।"

স্টফেনবার্গ চুপচাপ বসেছিলেন, আলব্রিখট গোপনীয় চিঠি লিখছিলেন। জেনারেল ফ্রোম এরই মধ্যে ঘোষনা করলেন, "ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে এই চক্রান্তকারীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এবং এখুনি এদের পিস্তলের মুখে দাঁড় করানো হবে।"

অলব্রিখট তখনও লিখে চলেছেন। জেনারেল ফ্রোম তাঁর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনার হল ?"

অলব্রিখট মুখ তুললেন, "হ্যাঁ।" চিঠি ভাঁজ করে ফ্রোমের হাতে তুলে দিলেন, ফ্রোম সবকটি চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। এলোমেলো ভাবে চিঠিগুলো ছড়িয়ে রইল।

"এবার চলুন।" ফ্রোম সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বিশে জুলাই, রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তাঁরা। স্টফেনবার্গ-এর হাত থেকে রক্ত চুয়ে পড়ছে। বিদ্রোহের শেষ অঙ্কে বিদ্রোহীরা এগিয়ে চললেন বধ্যভূমির দিকে।

এক সারিতে তারা দাঁড়ালেন। পাশাপাশি। একটু দূরেই রিভলবার হাতে বারজন সৈন্য। স্টফেনবার্গ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—"জার্মানী দীর্ঘজীবি হোক।" আরও কিছু তিনি বলতে গেলেন। সেই মুহূর্তেই জেনারেল ফ্রোম-এর নির্দেশ শোনা গেল—, 'ফায়ার।' ঝলকে ঝলকে গুলি বেরিয়ে এল। তাঁরা চারজন সামনের মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল তাদের দেহ। ছলকে আসা রক্ত চুইয়ে পড়ল আরও কিছুক্ষণ।
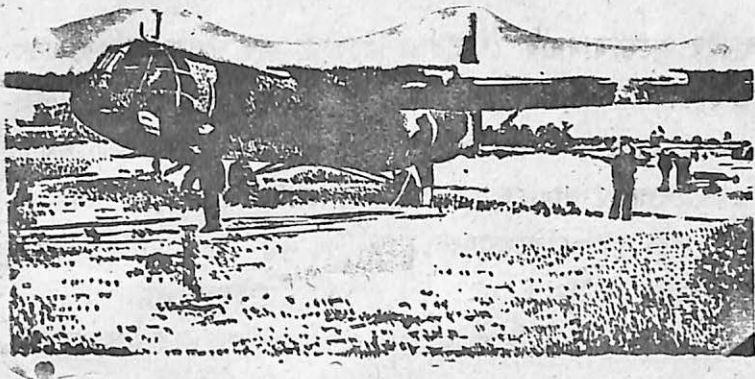
স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ

জার্মান ফিল্ড মার্শাল লকনোর হাতে তখন টেলিফোনের রিসিভার। চোখ সামনের ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে আগুনের লেলিহান শিখার দিকে। রিসিভারে মুখ রেখে তারস্বরে তিনি বলতে সুরু করেছিলেন, স্যার, আর আমাদের কিছু করার নেই। আমার চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে হুবহু তাই জানাচ্ছি। আগুনের তাপে আশপাশের বাড়ির দেওয়ালগুলো তাসের বাড়ির মতো ভেঙ্গে পড়ছে। আমি যে বাড়ির নিচে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফোন করছি সেই বাড়ির নিচ থেকে ছাদ পর্যন্ত সর্বত্র আগুনের লকলকে শিখা। বাড়িগুলো থেকে ছিটকে যা পড়ছে তা মানুষের দেহ। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় তারা ছাদ থেকেও লাফিয়ে পড়ছে। টাউন কম্যাণ্ডের বাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখোমুখি যুদ্ধ চলছে। বাড়ির একদিক থেকে রাশিয়ান সৈন্যরা গোলাগুলি চালাচ্ছে অন্যদিক থেকে জার্মানরা। বাইরে বরফ পড়ছে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভলগা এবং ডন নদীর দক্ষিণ দিকের শহর কারাপোভকা এখন মৃত মানুষের স্তূপে পরিণত হয়েছে।

কথা শেষ হওয়ার আগেই সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন ফিল্ড মার্শাল। যুদ্ধের অনেক মৃতদেহের মধ্যে লকনোর দেহও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। শুধু ফিল্ড মার্শালের হাতের ব্যাচটি দেখে বোঝা যাচ্ছিল দেহটি কার। সংজ্ঞা হারানোর মুহূর্তেও দৃঢ়ভাবে হাতে ধরা ছিল সেই ব্যাটন।

হিটলারের যুদ্ধোন্মাদনার খেসারত দিতে দু লক্ষ সৈন্যকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল, জার্মানীর কয়েক কোটি টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল এই যুদ্ধ আয়োজনে। তথাপি হিটলার অবিচলিত ভাবে একটি কথাই তার জেনারেলদের মাধ্যমে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈন্যদের পাঠাতেন—আর তা হল, আ-মৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

যুদ্ধের পরিস্থিতি কি? লকনও জানতে চেয়েছিলেন তার ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার রোসকির কাছে।

—খুব খারাপ অবস্থা। রাশিয়ানরা চারদিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের চারদিকে এখন রাশিয়ানরা--উত্তর দিয়েছিলেন রোসকি।

ফিল্ড মার্শাল আর কথা বাড়াননি। ঘুমন্ত মানুষের মত টালমাটাল পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ব্যাঙ্কারের দিকে।

অবস্থা এরকম হতে পারে এটা হিটলার ভাবেননি। তার ধারণা ছিল দুর্দ্ধর্ষ দুর্বার জার্মান বাহিনী শীতের রাশিয়ায় বরফ ডিঙ্গিয়ে রাশিয়াকে কব্জার মধ্যে নিয়ে আসবে। যুদ্ধ অবশ্যই হবে। তবে জার্মানীর শৌর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে রাশিয়ানরা। হিটলারের অমোঘ নির্দেশ বারবার শোনানো হোত সৈনিকদের— যতক্ষণ একটিও গুলি তোমার কাছে আছে ততক্ষণ জার্মানীর জন্য যুদ্ধ কর। একজন জার্মান কখনও পরাজিতের মৃত্যু মেনে নিতে পারে না। অস্ত্রবল আর সৈন্যবলের যোগান তোমাদের পাশে থাকবে। মাথা ঘামাবে না, বা মাথা খাটাবে না—অস্ত্রের গায়ে হাত রেখে জার্মানীর বিজয়ের ঐতিহ্য রক্ষা করার মহান দায়িত্ব তোমার হাতে।

কিন্তু হিটলার যে আশ্বাস দিতেন, গোয়েবলস তার প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে যা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেন তা বহু সময়ই বাস্তবের সঙ্গে মিলতো

না। ইউ-বোট-এর প্রতিশ্রুতি জেনারেল রোমেল পেয়েছিলেন। ইউ বোটের প্রতীক্ষায় থেকে রোমেল শুধু প্রতারিতই হয়েছিলেন। রাশিয়া আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যরাও এমনই প্রতারণার সামনাসামনি হচ্ছিলেন ক্রমশ। খাদ্যের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে তাদের বলা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত যা ছিল তা ভাঁড়ে মা ভবানী।

সরবরাহ অপ্রতুল তবু খাদ্য তো চাই। জার্মান সৈন্যরা প্রথমে রুমানিয়ান ক্যাভেলরির ঘোড়াগুলো মেরে সেই মাংস খেতে সুরু করল। সেটাও একদিন শেষ হয়ে গেল। নিজেদের গোলন্দাজ বাহিনীর ঘোড়াগুলোই তখন হয়ে উঠল তাদের খাদ্য। গোয়েবলস তার নিজস্ব কায়দায় তখনও জানাচ্ছিলেন সরবরাহ প্রচুর আছে—শুধু সময় মতো পৌঁছচ্ছেনা এই যা। কিন্তু জার্মান সৈন্যরা তখন একটা পাউরুটি ভাগ করে চারজনে খেত। অবস্থা ক্রমে আরো খারাপ হল। একটি রুটি তখন সাত ভাগে ভাগ করে তারা খেতে সুরু করলো। তারপর সারাদিনের জন্য মাত্র এক টুকরো রুটি বরাদ্দ হল এক একজন সৈনিকের। তবু হিটলার তথা গোয়েবলসদের কথায় তারা বিশ্বাস করেছিল—মাত্র কয়েক দিনের জন্য তো এই দুর্ভোগ। প্রচুর সরবরাহ আসছে। তখন পর্য্যাপ্ত খাবার আবার পাওয়া যাবে।

রাশিয়ান সৈন্যদের মনোবল ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন জোসেফ স্টালিন। তিনি বলেছিলেন অন্যত্র সব চুক্তিকে পদদলিত করে জার্মানী তার ফ্যাসিষ্ট কায়দায় আগ্রাসী নীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের এই লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রীরা জয়ী হয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। রাশিয়ার শীতের কামড় বা বলদর্প মদমত্ত জার্মান বাহিনীর আধুনিক অস্ত্র সম্ভারও নত হবে রাশিয়ানদের কাছে।

জার্মানদের মনোবল ক্রমশ কি রকম হচ্ছিল তার আভাস পাওয়া যায় জার্মান সৈন্যরা তাদের পরিজনদের যে চিঠি পাঠাতো তার থেকে। একজন সৈনিক লিখেছিলেন, প্রিয় ক্যারলিন, কহতব্য নয় এমন একটা জঘন্য জায়গায় এখন আছি। যুদ্ধের গতিক খুব সুবিধের নয়। কি যে হবে বুঝতে পারছি না।

অনেকেরই আলসার রোগ দেখা দিচ্ছিল। আলসারে পেট ফাঁকা রাখলে উপসর্গ বাড়ে। কিন্তু খাবার কোথায় যে খাবে? আলসার রোগীর সংখ্যা যত বাড়ছিল—সৈন্য শিবিরে হতাশাও ততই পরিব্যপ্ত হচ্ছিল।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে রাশিয়ার রেড আর্মি তথা রেড গার্ডকে জার্মানীর ষষ্ঠ বাহিনীর সেনাধিপতি পউলাশ একটি চরম পত্র পাঠালেন। চরম পত্রে বলা হয়েছিল—পরাভূত তোমরা হবেই। মিছিমিছি বিপুল রক্তপাত না ঘটিয়ে তার চেয়ে আত্মসমর্পণ কর তোমরা। আমাদের সেনাধ্যক্ষের কাছে তোমাদের গোলাবারুদ ট্যাঙ্ক যা আছে সবই দিয়ে দাও। যে সৈন্যরা যুদ্ধ বন্দী হিসেবে ধরা দেবে, পরে বরঞ্চ তাদের মাপ করার কথাও ভাববো আমরা।

জোসেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ভরোসিলভ জেনারেল জুকভদের তখন এই চিঠির উত্তর দেবার কোন ইচ্ছা জাগেনি। তাদের চেতনা জুড়ে যে ইচ্ছা ছিল এবং যে ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা হোল, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর আগ্রাসনকে পর্যুদস্ত করে রণোন্মত্ত হিটলারকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। জার্মান আক্রমণের চুল চেরা হিসাব করে তাঁরা তখন পাল্টা আক্রমণের এবং সম্ভাব্য বিজয়ের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের নির্দেশ ছিল রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে যে, জার্মান সৈন্য বা তাদের অগ্রগতি দেখা মাত্রই কামান দাগো। এগুতে ওদের দিয়ো না। ওদের পিছু হটতে বাধ্য কর।

ঠিক তাই তখন ঘটছিল রণাঙ্গন জুড়ে। রাশিয়ানরা প্রবল বিক্রমে যতই পাল্টা আঘাত হানতে সুরু করেছিলেন ততই মানসিক বিপর্যয় ঘটতে শুরু হয়েছিল জার্মান শিবিরে। প্যানজার ডিভিসনের কম্যাণ্ডার যখন সৈন্য সমাবেশে পুনর্বিন্যাসের জন্য জার্মান সেনাধিপতিকে জরুরী তার পাঠাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই চিফ অফ স্টাফ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তালিকা তৈরী করছিলেন কাদের কাদের কোর্ট মার্শাল বা সামরিক নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, কাপুরুষতা, কর্মে গাফিলতি, খাদ্য চুরি, সরবরাহ লুট কিংবা পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য।

এমনই একটা সময়ে এসে পৌঁছেছিলেন কর্নেল ক্যারাস। চিফ অফ স্টাফ তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন, ক্যারাস কোন সু-সংবাদ বয়ে আনেন নি। তার মুখের গাম্ভীর্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল পরিস্থিতি সুবিধের নয়। তবু চিফ অফ স্টাফ তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, খবর কি? পরিস্থিতি আয়ত্তে তো?

প্যানজার ডিভিশনের কর্নেল ক্যারাস বলেছিলেন সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস দরকার। আমাদের এখন সরে এসে অন্য দিক দিয়ে আক্রমণ শানানো দরকার। রাশিয়ান কামানের গোলা খেয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার থেকে—অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে পাল্টা আঘাত হানা দরকার।

—অসম্ভব। গর্জে উঠেছিলেন চিফ অফ স্টাফ। আমি কোন পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলতেই পারবো না। আমার ওপর হেইল হিটলারের তরফে কড়া নির্দেশ আছে—কোন অবস্থাতেই এক পা পিছু-হটা চলবে না। ক্রমাগত, ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত গনার্ তখন বিমূঢ়। তার দিকে ঘুরে তাকালেন চিফ অব স্টাফ। বললেন, না, না, দশ বিশ মিটারও সরে আসা চলবে না। ঘাটি আগলে পড়ে থাকতে হবে। না, এখন পিছু হটার কথা উচ্চারণও করবেন না। অবস্থা এখন খুবই গুরুতর। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে আছে প্যানজার বাহিনীর শৌর্যের ওপর। গোটা ষষ্ঠ বাহিনীর ভাগ্য নির্ভর করছে আপনাদের সাফল্যের ওপর।

আপনারা এখন পিছু হটবেন কি? আপনারা জানিয়ে দিন সবাইকে যে মহান হিটলার বলেছেন, একটি পা ও পিছু হটা চলবে না।

'এক পা পিছু হটা চলবে না'—এই নির্দেশনামা প্যানজার ডিভিশনের কম্যাণ্ডার যেমন পেয়েছিলেন তেমনি পেয়েছিলেন গনার্ ডামে। ডামের টেলিফোন নির্দেশনামা জেনেছিলেন এণ্ডার্স ও মেজর কেইল। এণ্ডার্স এর সঙ্গে কথা বলার সময় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন ডামে। তার থেকেও বেশী উত্তেজিত এণ্ডার্স তাদের কথোপকথন শেষ হবার আগেই এক ঝটকায় টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন।

সেই রাতে আকাশ লাল করে হঠাৎ গোলার আওয়াজ আর বারুদের গন্ধ বাতাস ভারী করে তুলেছিল। দৌড়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মেজর কেইল। সমস্ত সৈন্যকে ডেকে এক নিঃশ্বাসে কথা বলতে বলতে তিনি তার বিশ্বস্ত সৈন্যদের বলেছিলেন হান্স, হেইনরিশ, জর্জ সবাই তৈরী হয়ে নাও। আসছে—আমাদের ওপর আক্রমণ আসছে। প্রতিরোধ করতে হবে।

কম্যাণ্ডার বুখনার বাঙ্কার আর রেশন ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই রাতে। রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর ক্রমাগত তোপ বর্ষন তখন অব্যাহত। বাঙ্কারের ইটে ও গোলার ঘায়ে আগুন জ্বলে উঠল। রেশন ডিপোটাও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তের মধ্যে। বুখনার একটু সরে এসে দাঁড়ালেন। পায়ের নিচে শীতের রাশিয়ার বরফের চাদর। তার পাশে এসে দাঁড়ালেন এ্যাডজুটেন্ট লেপ্টেনেন্ট লুজ ও লেপ্টেনাণ্ট স্ট্যামফার। বুখনারের চোখ তখন রাশিয়ান

সৈন্যদের দিক থেকে ধেয়ে আসা অবিরাম গোলার দিকে দুর্বল জার্মান প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠা অ-নিয়মিত গোলাবর্ষনের দিকে। হঠাৎ তার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল। চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন তিনি, উন্মাদ, একেবারে উন্মাদের মত সব কিছু করা হচ্ছে। প্রতিবাদও করতে পারছিনা। প্রতিবাদের কোন উপায় নেই। জার্মান ভাষায় তিনি গজগজ করছিলেন "গ্রসার গট ইন হিনেল"।

মুখের কথা তার শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে একটি রাশিয়ান গোলা এসে ফাটলো খুব কাছে। বুখনার পড়ে যাচ্ছিলেন। তাকে ধরে ফেললেন তার এ্যাডজুমেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট লুজ। স্ট্যামফার তখন ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছেম। সার্জেণ্ট জানুশেক মাটি থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন। রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। একহাতে মুখ ঢেকে জানুশেক ফিসফিস করে বললেন, রাশিয়ানরা পিছু হটার বদলে পাল্টা আঘাত হেনে আমাদের খুবই বেকায়দায় ফেলে দিল মেজর।

মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে পূর্ব প্রুশিয়ার সৈন্যদের নিয়ে মেজর কেইল তখন এগিয়ে চলেছিলেন রেল গুমটির দিকে। দুর্বার রাশিয়ান প্রতিরোধের মুখে তারাও পড়লেন। একটা গোলা কাছাকাছি পড়তেই সৈন্যরা সব মাটিতে বসে পড়ল। পাচক হেইনরিশ হালুইট মাথা তুলে দেখলেন মেজর কেইল এর একটা পা জখম হয়েছে। তবু তিনি এগুবার চেষ্টা করছেন। সার্জেণ্ট মেজর গোরিট চিৎকার করে বললেন, হের মেজর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বৃষ্টির মত রাশিয়ান গোলা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, আপনি যাবেন না।

মেজর কেইল কোন কথাই কানে নিচ্ছিলেন না। বরফের ওপর দিয়ে আহত পা টেনে টেনে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হেইনরিশ হালুইট ঘুরে তাকালেন ভারকাণ্ট এর দিকে। বললেন, মেজরের কি হল কি? কারো কথাই শুনছেন না। কার্ল তুমি একটু দেখনা! তোমার কথা শুনতে পারে।

কাল´ দীর্ঘদিন ধরেই কেইলকে চিনতেন। চিনতেন কেইলের প্রেমিকাকেও। কাল´ এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন—হের মেজর হের মেজর !

কেইল তবু এগিয়ে চললেন। একবারের জন্যও পিছু ফিরে দেখলেন না। কার্ল একবার পিছনের দিকে তাকালেন। দেখলেন তার পেছনে আর কেউ আসছেনা। চারদিকের ধোঁয়ায় পিছনের কিছু দেখাও যাচ্ছে না।

পাগল—একেবারে পাগল হয়ে, গিয়েছে লোকটা। বিড়বিড় করতে করতে এগুচ্ছিলেন কার্ল। মাত্র কয়েকটা পা এগিয়ে ছিলেন কেইল, গোলার শব্দ। হিটলারী পাগলামির শিকার মেজর কেইল এর দেহ তার পরই একটি মৃতদেহে পরিণত হয়ে দু'টুকরা হয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

গোয়েবলসীয় প্রচার যন্ত্র ফ্যাসিষ্ট হিটলারের মদত যোগানোর জন্য তখন প্রচার করেছিল—ফ্যুয়েরারের অপ্রতিরোধী বাহিনী এগিয়ে চলেছে। এক পাও পিছু হটতে হচ্ছেনা। ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে জার্মান বাহিনী। ব্যাটালিয়ন নং ৯ মেজর কেইলের নেতৃত্বে দুর্বার ভাবে এগিয়ে চলেছে।

জার্মানদের পিঠ ক্রমশ দেওয়ালে ঠেকছিল। গণফৌজ তথা লাল-বাহিনী তখন তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। মেজর হোলমার 'টার্টার' ওয়ালের আটশো মিটার দূরে তখন জার্মান কামান গুলোকে নতুন করে সাজাচ্ছিলেন। কামানগুলো তাক করা ছিল ষ্টালিনগ্রাড ও ভদকার দিকে। এবার সেগুলো এমন ভাবে রাখা হল যাতে প্রয়োজনে উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করলেও কামান সেদিকেও দাগা যায়।

হোলমারের কাছে প্রচুর অস্ত্র মজুত ছিল। যখন জার্মান হেড-

কোয়ার্টার্স জানতে পেরেছিল যে, লাল ফৌজ চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে তখন তাকে জানানো হয়েছিল অস্ত্রের ভাণ্ডার সব নষ্ট করে দাও। লাল ফৌজের হাতে যেন এগুলি না যায়। হোলমার আদেশ মানেননি। কিছুটা অস্ত্র নষ্ট করে বাকিটা মজুত রেখেছিলেন—প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। সেই অস্ত্রগুলো ব্যবহারের প্রস্তুতি তিনি নিচ্ছিলেন।

সেদিন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৮°, ভলগা থেকে উঠে আসা কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছিল। মেজর হোলমার তার লিম্বার ও ওইৎজার কামান দিয়ে টার্টার ওয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ গোলাবর্ষণ শুরু হল। লাল ফৌজের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মধ্যে দিশেহারা মেজর হোলমারের কোন কামানই তখন গর্জাবার সুযোগ আর পায় নি। দ্রুত পিছু হটে তারা টার্টার ওয়ালের দিকে সরে গিয়ে তখনকার মত প্রাণ বাঁচাতে তারা ব্যস্ত। তারই মধ্যে মলিন বেশ মলিন মুখে একজন কাঁপতে কাঁপতে মেজর হোলমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। সে বলল, তার নাম লকনও। সে লুডট রেজিমেণ্টের ব্যাটালিয়ন লিডার কিন্তু রেজিমেণ্টের কে যে কোথায় তা সে জানেনা।

মেজর হোলমার তার হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃদু স্বরে লকনও বলেছিলেন, কি দেখছেন হের মেজর? আমার হাত একদা এখানে ছিল। এখন আর নেই। উড়ে গেছে গোলার ঘায়ে।

হোলমার তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার ডিভিশনের খবর কি?

ক্লান্তি আর অবসাদে প্রায় বুজে আসা চোখে লকনও বলেছিলেন, আমার ডিভিসনের সৈন্যরা? তারা কোথায় গিয়েছে কিছু জানিনা, আমি জেনারেলকে রাস্তার দিকে দেখেছিলাম। সে ও জানতো না কি ঘটেছে আমাদের ডিভিশনের। সেখান থেকে সে এক দিকে চলে গেল আমি অন্যদিকে।

পরের দিন আকাশ ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল। মেজর হোলমার তার

পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তৈরী হয়েছিলেন। ট্রুপ মার্চ করে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন বিমানবন্দরের দিকে। সেখানে ছিলেন জেনারেল গিস্ট। উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল গিস্ট এর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ শানানো। জেনারেল হোলমার এবার লাইন দিয়ে তার বাহিনী সাজালেন। কামানগুলো তখন আক্রমণের জন্য তৈরী। হোলমারের নির্দেশে গর্জে উঠেছিল হাউৎজার কামান আর মর্টার। বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া। লাল ফৌজের সম্ভাব্য আক্রমণের দিকে তাক করছিলেন তিনি।

হঠাৎই দেখা গেল রাশিয়ানরা টার্টার ওয়াল পেরিয়ে এসে পাল্টা আক্রমণ হানছে। রাশিয়ান ট্যাঙ্কও ধেয়ে আসছে দ্রুত গতিতে। জেনারেল হোলমার চিৎকার করে বলেছিলেন, কামানে গোলা ভরো। ক্রমাগত কামান দাগো। ওরা পাল্টা প্রতিরোধে নেমেছে। ওদের প্রতিরোধ চুরমার করে দাও। ট্যাঙ্ক বাহিনী সামনের দিকে আগুয়ান হোক এখনি।

লাল ফৌজ আঘাত হেনেছিল গোলন্দাজ বাহিনীকে। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছিল বরফের মধ্যে। তারই মধ্যে মেজর হোলমার শুনতে পেলেন কে যেন বলছে গোলা বারুদ শেষ। কামান দাগার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই।—তাহলে ট্রাক্টর, ব্যারেল, লরি সব কিছু পুড়িয়ে দাও। যুদ্ধ করার মত কোন অস্ত্র যখন আমাদের আর নেই তখন এই সব পুড়িয়ে দাও। লাল ফৌজের হাতে এগুলো পৌঁছতে দেব না।

উনিশশো বেয়াল্লিশের বাইশে নভেম্বর অপারেশন 'হেডহেজ' এর অর্ডার এসে পৌঁছেছিল কর্ণেল ক্যারলের কাছে। এসব ধরণের সেনা মোতায়েন পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটেনি। ফ্যুয়েরার হিটলারের বিজয় বাসনা তখন অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জন্য এক মরীয়া প্রচেষ্টার রূপ নিচ্ছিল। দুই ডিভিশনে মোট তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে

ফিল্ড মার্শাল ভন মেইনস্টেন, ফিল্ড মার্শাল ভন ওয়েল সৈন্য পরিচালনার জন্য উপস্থিতও হয়েছিলেন।

কিন্তু কোন অবস্থার মধ্যে জার্মানরা এমন সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল? রাশিয়ায় শীত তখন জেঁকে বসেছে। বরফের চাদর বাড়ীর ছাদে, রাস্তায়। প্লেন ওঠা নামা অসম্ভব ঘন কুয়াশার জন্য। তার চেয়েও বড় কথা, এই তিন লক্ষ সৈন্যের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কি করে দিনের পর দিন করা যাবে—তার কোন প্রস্তুতিই ছিলনা তখন।

এমন পরিস্থিতিতেও ফিল্ড মার্শাল ভন মেইনস্টেন বলেছিলেন, ফ্যুয়েরার হিটলারের আদেশ আমরা মানছি। অবস্থা যা তাতে এই সিদ্ধান্ত সময়োচিত হল কিনা সে বিষয়ে আমরা একমত হয়তো হলাম না। তবু আমরা উচ্চতম কতৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাবো।

শুধু সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়া, অপ্রচুর সরবরাহ এবং শত্রুপক্ষের প্রবল বিক্রমের সামনে যে জয়ী হওয়া যায়না এটা হিটলার বুঝতে চাননি। আর তার এই না চাওয়ার খেসারত দিতেই লক্ষ লক্ষ তরুণ জার্মান সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাডের লড়াইতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

স্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এগুচ্ছিলেন লেপ্টেনাণ্ট লকনও। হঠাৎ সুরু হয়ে গেল রাশিয়ান মর্টারের আক্রমণ। পাল্টা আক্রমণ চালালো জার্মানরা। দুই প্রতিপক্ষের আক্রমণের মধ্যে ভাঙ্গা বাড়ীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন লেপ্টেনাণ্ট লকনও।

আস্তে আস্তে লকনও বরফ ছাওয়া মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে অবস্থা কি তা বুঝতে চাইলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন ১১৩ তম ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের জেনারেল সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দেখতে পেলেন লকনওকে। বললেন—কি ব্যাপার? তুমি এভাবে, এখানে?

—কি করব জেনারেল, আমার হাতের তো বারোটা বেজে গিয়েছে

গোলার ঘায়ে। অসম্ভব যন্ত্রনা। একটু ওষুধপত্র দরকার। ব্যাণ্ডেজ দরকার। কিন্তু কোথায় কি? আমি সেই থেকে একটু তুলো ব্যাণ্ডেজ একটু ওষুধের জন্য হা পিত্যেশ করে ছুটে বেড়াচ্ছি।

—তুমি এক কাজ কর—বাঙ্কারে চলে যাও। ওখানে মেডিকেল অফিসার আছে। কিছু ওষুধপত্রও আছে।

—হের জেনারেল, একটু থেমেছিলেন লেপ্টেনাণ্ট লকনও। —তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি করে বলুনতো যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা এখন কি? কি ঘটতে চলেছে শেষ পর্যন্ত!

জেনারেল কোন উত্তর দেননি। ঘাড় ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—সবই ভবিতব্য।

ষ্ট্যালিনগ্রাড দখল বা পুনরুদ্ধারের জন্য জার্মান আক্রমণ বা রাশিয়ার পাল্টা আক্রমণ ক্রমশ ভয়ঙ্কর আকারে নিচ্ছিল। রাশিয়ান ট্যাঙ্কবাহিনী ক্রমেই আগুয়ান হচ্ছিল। টাটার ওয়ালের গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে পিল পিল করে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে জার্মানরা তখন দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক দৌড়চ্ছে। লকনও দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাচ্ছিলেন। কিন্তু দৌড়ে আর কতটুকু যাওয়াই বা যায়। দৌড়তে দৌড়তে একটা ছোট সরু গলির মুখে এসে পড়লেন তিনি। কিন্তু এবার কোনদিকে যাবেন? মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে কান পাতাই তখন দায়। আর ভরসা পেলেন না লকনও। যে পথে তিনি এসেছিলেন সেই পথেই তিনি আবার ফিরে চললেন। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ তখন আরো অনেক বেড়েছে। তাদের ঘরের মতো বহু বাড়ি মাটিতে পড়ে রয়েছে। এখানে সেখানে গলিত মৃতদেহ। জার্মান সৈন্যরা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। কেউ যেন নেই—কোথাও নেই।

কুয়াসার মধ্যে দিয়ে তিনজন সৈন্য যেন মাটি ফুঁড়ে লকনও এর সামনে এসে দাঁড়াল। লকনও তাদের বললেন, কোন রকমে এই আমিতো পালিয়ে এলাম। তোমরাও দেখছি পালাতে পেরেছো। কিন্তু কোথায় এলাম বল তো? এখানে জার্মান শিবির আছে নাকি রাশিয়ানদের ডেরাতেই এসে পৌঁছলাম।